মল্লরী

বিমল কর

বাসন্তী : ১৫৩ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট

প্রথম প্রকাশ
দশহারা ১৩৬৩
প্রকাশক
মদনমোহন সাধুখাঁ
১৫৩ কর্নোআলিস স্ট্রিট
কলকাতা ৬
মুদ্রক
অমিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
গোলাপ প্রিন্‌টিং ওঅর্‌কৃস্
১২ হরীতকী বাগান লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদশিল্পী
সুবোধ দাশগুপ্ত
প্রচ্ছদ মুদ্রক
কলার প্রিন্‌টার্‌স্
প্রুফ সংশোধক
রাধাকান্ত শী
দাম
দু' টাকা

শ্রীনীরেন্দ্র চক্রবর্তী

বন্ধুবরেষু

এই লেখকের ঃ

গ্যাসবার্নার

হ্রদ

ঝড় ও শিশির

ত্রিপদী

বরফ সাহেবের মেয়ে

কাচঘর

অবগুণ্ঠন

দেওয়াল

জোনাকি

পিঙ্গলার প্রেম [যন্ত্রস্থ]

রাত-পাখির ডাক	৫
প্রথম কান্না	১৪
অশ্বত্থ	৩৩
অ্যাল্‌বাম	৬৪
সাদা-কালো	৯০
ময়ূরী	১০৬

রাত-পাখির ডাক

শুনলে মনে হবে পাখির ডাক। আসলে ওটা প্রেমবাহাদুরের ইসারা। গৌরীমায়াকে ডাকছে। বাইরে।

ডাকলেই তো আর পড়ি-মরি ক'রে ছুট দেওয়া যায় না! ভীমবাহাদুর ঘুমিয়েছে, না নেশার ঘোরে চোখ উল্‌টে পড়ে আছে, দেখতে হবে। দেড় হাতের শয়তানের বাচ্চাটাও এখুনি হয়তো গলা-কাটা মুরগির মতন চেল্লাতে শুরু করবে। যেমনি বাপ, তার তেমনি বাচ্চা।

কুপিটা হাতে নিয়ে গৌরীমায়া ভীমবাহাদুরের মুখটা একবার ভাল ক'রে পরখ করল। লোকটা বুড়ো হয়ে গেছে। দেখলেই বোঝা যায়। মাংস কুঁচকে গেছে গাল-কপালের, বুড়ো বলদের মতন ধুঁকোনো চেহারা, নেশায় টং হবার মতন রক্ত নেই আর, এখন নেশা করলে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে।

ভীমবাহাদুর বেহুঁশ হয়েই ঘুমোচ্ছে। খাটিয়াটা দেহের ভারে ঝুলে পড়েছে। নাকের ফুটো দিয়ে ফোঁ ফোঁ শব্দ। মুখটা আধখানা খোলা, খানিকটা থুথু জমেছে গালের পাশে। মদের গন্ধ।

শয়তানের বাচ্চাটা বাপের পিঠ লেপ্‌টে ঘুমিয়ে। মুখটা হাঁ। পিচুটিতে চোখের পাতা এঁটে গেছে।

বাইরে থেকে কির···র·· চিক্—কির···র···চিক্···চিক্···। সেই বুনো-পাখি-ডাকটা আবার শোনা গেল। প্রেমবাহাদুর ডাকছে।

কুপিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে গিয়েছিল গৌরীমায়া। কি মনে ক'রে

আর নেভাল না। দরজার এক পাশে আড়াল ক'রে রাখল। ঘরটা যাতে অন্ধকার ঠেকে।

বাইরে ঝাপসা জ্যোৎস্না। বেড়া টপকে বড় বড় ক'টা গাছের কাটা গুঁড়ির উপর পা ফেলে ঠিক জায়গাটিতে এসে হাজির গৌরীমায়া।

পানিশাজ গাছের তলায় পাথরটা ফাঁকা। প্রেমবাহাদুর নেই।

অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল গৌরীমায়া। আশপাশ তাকাল। চাঁদের আলোও যত, ছায়াও তত। সবটা ভাল ক'রে ঠাহর করা যায় না। গেল কোথায় প্রেমবাহাদুর !

দূর-দূর নজর ক'রে দেখছিল গৌরীমায়া। ফুরফুর হাওয়া দিয়েছে এখন। আবার সেই ডাক উঠল, বুনো রাত-পাখির কির · র চিক্··· চিক্ ডাক। বার তিনেক ডাক দিয়েই চুপ।

প্রেমবাহাদুর বটে। থাকর গাছের ঝোপ থেকে ডাকটা আসছে। আজ একটু দূরে, আরও একটু আড়ালে এসে লুকিয়েছে বদমাসটা।

গৌরীমায়া হাল্কা পায়ে ঘাস, পাথর, কাঠ, কাঁটা টপকে থাকর গাছের তলায় গিয়ে হাজির।

এখানেও প্রেমবাহাদুর নেই।

এবার রীতিমত অবাক হল গৌরীমায়া। গেল কোথায় লোকটা ! এই ডাকল, এই উড়ে গেল ! ঝাপসা জ্যোৎস্নায় যতটা দেখা যায়, খুব ভাল ক'রে দেখল গৌরীমায়া। প্রেমবাহাদুরের চিহ্ন নেই কোথাও। নিশ্চয় কোন ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে ডাকছে।

বার-বার তিনবার। শেষ পর্যন্ত চটে উঠল গৌরীমায়া। লুকোচুরি খেলার সময় নাকি এখন ! কুঠিতে ভীমবাহাদুর ঘুমোচ্ছে, বাচ্চাটাও। দুটোই তো সমান ! ঘুম ভাঙলে একটা চেল্লাবে, অন্যটা মুরগি-কাটার ডাক ছাড়বে। তখন ?

রাগ ক'রে হনহনিয়ে কুঠির দিকেই ফিরছিল গৌরীমায়া।

হঠাৎ কোন গাঢ় ছায়া থেকে যেন আর একটা ছায়া নিঃশব্দে সরে এসে খপ ক'রে হাত ধরে ফেলল গৌরীমায়ার।

হাত ধরতে গৌরীমায়া চমকায় নি। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই সত্যি চমকে গেল।

প্রেমবাহাদুর নয়, কর্ণবীর।

ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চাইল গৌরীমায়া। পারলে না। বেশ শক্ত ক'রেই হাতটা ধরেছে কর্ণবীর।

এবার হাত টেনে একটা কামড় বসাবার চেষ্টা করল গৌরীমায়া। কেমন এক পশুর মতন ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ ক'রে হেসে আরও তাকে বুকের উপর জাপ্‌টে ধরল কর্ণবীর।

গৌরীমায়া গালাগালি দিল, যা মুখে আসে তাই বলে। গালাগালে ছাড়বার পাত্র নয় কর্ণবীর। বলছিল ও, 'ওই বুড়োটার ঘর করবি কত-দিন আর! একটা লাশের সঙ্গে! তারপর আছে না ওই বাচ্চাটা—একরত্তি শয়তান! তোর পেটের বাচ্চা নয়, কার না কার, তার জন্যে কিসের তোর গতর দেওয়া! চল আমার সঙ্গে, দেড় শ' টাকা আমি দিয়ে দেব ভীমবাহাদুরকে—আমার ঘর করবি।'

কর্ণবীরের বুক আর দু হাতের মধ্যে গা যেন পিষে যাচ্ছিল গৌরীমায়ার। আগুনের মত গরম লাগছিল। ছটফট করছিল ও।

'করব না তোর ঘর, বদমাস!' গৌরীমায়া নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে ছটফট করতে করতে বলছিল, 'ভীমবাহাদুরেরই ঘর করব আমি। তোকে টাকা দিয়ে আমায় ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে না।'

কর্ণবীর হাসছিল তেমনি ক'রে। বলছিল, তোর প্রেমবাহাদুর পাতি-

তোলা কুলি। পেটে খেতে রোজগারি শেষ হয়ে যায়। তোকে তার ঘরে নিয়ে যেতে হলে এ কামাইএতে হবে না !'

আলগা করেছিল হাত কর্ণবীর। এক ঝটকায় ছিটকে বেরিয়ে এসে গৌরীমায়া পথ থেকে একটা কাটা ডাল তুলে নিল। থুথু ছুঁড়ল থু থু ক'রে কর্ণবীরের দিকে। গালিগালাজ দিচ্ছিল যা মুখে আসে, আর বলছিল, 'তোর ঘর করতে রূপমায়াকে নিয়ে যা, কাঞ্চিকে, দিলমায়াকে। কন্তি কলি তাদের পরাগে যা, কুত্তা কোথাকার ! ভাগ্... ভাগ্...।'

কর্ণবীর তবু হাসছিল। ঝাপসা চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

এই প্রথম নয়। ক'বারই এমনি হয়েছে। প্রেমবাহাদুরের ইসারা ভেবে গৌরীমায়া রাতের অন্ধকারে কুঠি ছেড়ে বাইরে এসেছে পথে, আর প্রেমবাহাদুরের বদলে অন্য কেউ—দলবাহাদুর, জংবাহাদুর, কর্ণবীর এমনি কেউ-না-কেউ—তাকে একলা পেয়ে এসে পথ আগলেছে। তাদের সকলেরই এক কথা : বুড়ো মড়া ভীমবাহাদুরের ঘরে পড়ে আছিস কেন ! তাও একটা বাচ্চা আছে তার—তোকেই আগলাতে হয় ! আমার ঘরে চল—শাদি করব—দেড় শ' টাকা দিয়ে দেব ভীমবাহাদুরকে।

মাঝে মাঝে গৌরীমায়ার মনে হয়—আর সে পারে না। প্রেম-বাহাদুরের জন্যে দিনের পর দিন অপেক্ষা ক'রে কি লাভ ! সে পারবে না। তার ক্ষমতায় কুলোবে না। অন্য কারুর ঘরেই চলে যাক ও !

মন কিন্তু গৌরীমায়ার কাউকেই চায় না, প্রেমবাহাদুর বাদে। প্রেম-বাহাদুর এখনও ঠিক পুরো জোয়ান পাহাড়ী নয়। গৌরীমায়ার মাথায়-মাথায়, কি একটু বেশি লম্বা হবে ! তেমন তাগদবালা চেহারাও নয় ! বরং দুবলা-গোছের। বয়সটাও কম ! গৌরীমায়ার চেয়ে দু-চার বছর

যদি বেশি হয়! চা-বাগানে পাতি তোলে, আর চাবি-টেপা কালো বাঁশি বাজায়। ছোঁড়াটা কোথা থেকে যে এই অদ্ভুত বাজনা শিখে এসেছিল, কে জানে! বাজায় কিন্তু চমৎকার।

একদিন এই বিদেশী বাঁশি শুনেই গৌরীমায়ার প্রথম চোখ পড়েছিল ছোকরার উপর। তার আগে কেই বা প্রেমবাহাদুর, কেই বা দলবাহাদুর, অত খোঁজ-খবর নেবার দরকার পড়ে নি গৌরীমায়ার। ভীমবাহাদুরের কুঠিতে গায়ে-গতরে খেটে, তার বাচ্চাটাকে পিঠে বয়ে, চড়চাপাটি মেরে, আর চা-বাগানে পাতি তুলে তুলে দিন কেটে যাচ্ছিল একরকম। তার বয়সটা যে আঠার-বিশ, আর ভীমবাহাদুরের পঞ্চাশ-টঞ্চাশ—এ হিসেব করবার দরকারই হয় নি গৌরীমায়ার! ভীমবাহাদুর তিন শ' টাকা দিয়ে গৌরীমায়াকে তার রুগ্ন বুড়ি মার কাছ থেকে নিয়ে এসেছিল। তা একরকম শাদি ক'রেই এনেছিল, বলা যায়। অবশ্য গৌরীমায়া কোন স্বাদ বোঝে নি সে বিয়ের। ভীমবাহাদুরের ছেলেটা তখন আরও কচি, চা-বাগানে পাতি-হাজরি তখন আরও কম। ছেলে বইতে, পেটের যোগান করতেই সকাল-সন্ধ্যে শেষ হয়ে গেছে। ভীমবাহাদুর কুঠিতে রোজ এসেছে না-এসেছে, মদ খেয়ে কোথায় পড়ে থেকেছে, জুয়ায় হেরে গৌরীমায়ার চাল-আটার টাকা কেড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে, মারধোর দিয়েছে যখন-তখন—তবু গৌরীমায়া কখনও ভাবে নি, এই ঘর, ভীমবাহাদুরের ঘর, সে ছেড়ে চলে যেতে পারে অনায়াসেই। ইচ্ছে করলেই। বাচ্চাটাকে এত ঘেন্না হত না তখন।

প্রেমবাহাদুরের সেই আজব বাঁশি একদিন শুনল গৌরীমায়া সন্ধ্যেবেলা। বাগানের ছুটির পর বাজার থেকে সওদা ক'রে ফিরছিল—হঠাৎ কি মনে ক'রে গেল একবার বুড়ি মাটাকে দেখতে। রাস্তাটা নদীপথের। তা একটু দূরই। ফেরার পথে রাস্তা ফাঁকা। সেদিনও

জ্যোৎস্না ছিল, ফুটফুটে আলো—পাথর-ঢালা রাস্তা চিক্‌চিক্‌ করছিল; আর শিরীষ, খাকর, সাদাশি, লামপতি গাছের ডাল বয়ে চাঁদের আলো গড়িয়ে পড়ছিল। একলা ফিরছিল গৌরীমায়া। হঠাৎ সেই বাঁশি। আজব বাঁশি। তার সুর আলাদা, স্বর আলাদা। জীবনে যা কোনদিন শোনে নি গৌরীমায়া। পথ চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নদীপথ দিয়েই ফিরছিল প্রেমবাহাদুর। গৌরীমায়া দাঁড়িয়ে ছিল চুপ ক'রে, গাছের ছায়ার মতন অনড়, স্তব্ধ।

সেই রাস্তায় আলাপ।

'অন্য বাগান থেকে এসেছি। এ বাঁশি বিলিতী বাঁশি। বাগানের পাগলা সাহেবের ভাই আমায় শিখিয়েছিল।' প্রেমবাহাদুর বলেছিল তখন।

তারপর ওরা দুজনে, গৌরীমায়া আর প্রেমবাহাদুর, ফিরেছে এক-সঙ্গে, পাশাপাশি।

ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা। গৌরীমায়া বুঝতে পারছিল, বুড়ো ভীমবাহাদুরের ওই ঘোলাটে নেশাটে চোখ আর আফিং-খাওয়া অসাড় শরীর ছাড়া আরও নতুন রকমের এক চোখ আর শরীর আছে। ভীমবাহাদুরের নোংরা শয়তান বাচ্চাটা ছাড়াও বইবার মতন এক ভার আছে।

তখন থেকে ভীমবাহাদুরের উপর যত ঘেন্না, তত ঘেন্না তার ছেলের উপর। ঘরটাই আর ভাল লাগছিল না গৌরীমায়ার!

একদিন প্রেমবাহাদুরের কাছে কথাটা খুলেই বলল গৌরীমায়া। 'আমায় তুই নিয়ে চল্‌। যেখানে খুশি। নয়তো নদীর জলে গিয়ে ডুবব আমি। সাপের ছোবলে পা বাড়িয়ে দেব।'

প্রেমবাহাদুর কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল, 'টাকা জমাচ্ছি। দেড় শ' টাকা যে চাই রে, গৌরীমায়া! টাকা জমলেই তোকে ভীমবাহাদুরের

কুঠি থেকে টেনে নিয়ে আসব।’

সেই টাকা আজও জমছে—একটা বছরেরও উপর হতে চলল। বাগানে চা-পাতি তুলতে তুলতে গৌরীমায়া অন্তত বিশবার টাকার হিসেবটা করবার চেষ্টা করে—কত টাকা জমল প্রেমবাহাদুরের এত দিনে। কাজের মধ্যে ফাঁক পেলে, ফাঁকি মারতে পারলে শিরীষ গাছের তলায় বসে টাকার হিসেবটা করবার চেষ্টা করে গৌরীমায়া। দেড় শ’ টাকা জমাতে প্রেমবাহাদুরের কত দিন লাগবে! এক বছর তো হতে চলল—আরও দু-চার মাস নাকি! পাতি পয়সা পাবার দিন ফুরিয়েছে এখন—রোজগার কম। দেরিই হবে হয়তো!

তা হ’ক, তবু গৌরীমায়া অপেক্ষা করবে!

করছে এতদিন। এখন আর পারে না।

তা ছাড়া এ কি! আজকাল প্রায়ই রাত্রে কুঠির বাইরে সেই পুরনো ইসারায় পাখির ডাক ডেকে প্রেমবাহাদুর ওকে বাড়ির বাইরে টেনে আনে। কিন্তু আশ্চর্য, প্রেমবাহাদুর থাকে না। তার বদলে আর-আর অন্য কোন পাহাড়ী—কর্ণবীর, দলবাহাদুর এমনি সব বদমাস লোকজন।

প্রেমবাহাদুরকে বললে বলে, ‘তুই ভুল শুনেছিস। আমি ডাকি নি—পাখিই ডেকেছিল।’

গৌরীমায়া নিজের কানকে অবিশ্বাস করতে পারে না, আবার বিশ্বাস করতেও পারে না। ভাবে, কুঠির বাইরে যাবে না আর, ডাকুক পাখি। কিন্তু ডাক শুনলে থাকতে পারে না। মনে হয়—আজ আর পাখি নয়, প্রেমবাহাদুরই ডাকছে।

ক’দিন পরে আবার সেই ডাক। বুনো রাত-পাখির ডাক—কির…

র···চিক্···কির।

কুপিটা জ্বলছিল। ভীমবাহাদুর ঘুমোচ্ছে। তার পিঠে লেপ্‌টে সেই শয়তানের বাচ্চাটা।

গৌরীমায়া উঠল। কান পেতে পেতে ডাকটা শুনল। প্রেমবাহাদুরের ইসারাই। পাখি নয়।

তবু একবার মনে হল—যাবে না গৌরীমায়া, যদি আজও না প্রেমবাহাদুর এসে থাকে!

বসেই ছিল গৌরীমায়া। উঠছিল না, কুপিটা দেখছিল, কুপির সেই আলো।

ডাকটা থামল না। বেড়েই চলল। বারবার। থেকে থেকে। শেষ পর্যন্ত যেন পাগল হয়ে।

কোনদিন এমনভাবে আর প্রেমবাহাদুর ডাকে নি। গৌরীমায়া উঠল। কুপিটা আজ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে কুঠির বাইরে চলে এল। সেই ঝাপসা জ্যোৎস্না, গাছ-গাছালির ছায়া। বেড়া টপকে, পাথর ডিঙিয়ে, কাঠের গুঁড়িতে লাফিয়ে লাফিয়ে থাকর গাছের তলায় এসে দাঁড়াল গৌরীমায়া। প্রেমবাহাদুর নেই।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল গৌরীমায়া। আজও সে ভুল করল? এত শোনার পর—এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কান খাড়া ক'রে থাকার পরও?

গৌরীমায়া ফিরছিল। দূর থেকে আবার সেই পাখির ডাক। কি যে হল গৌরীমায়ার—যে দিক থেকে শব্দটা আসছিল, ছুটল সে দিকে।

গাছতলা ফাঁকা। কেউ নেই।

ডাকটা এবার আরও একটু দূরে শোনা গেল।

রোখ চেপে গিয়েছে গৌরীমায়ার। কাঠ-কুটো, পাথর, কাঁটা— গৌরীমায়া এড়িয়ে পেরিয়ে ডিঙিয়ে এগিয়ে গেল।

প্রেমবাহাদুর নেই।

কিন্তু অন্য একজন ছিল। বচনবাহাদুর। ব্যবসাদার আর সর্দার পাহাড়ীদের।

বচনবাহাদুর খপ্ ক'রে ধরে ফেললে গৌরীমায়াকে। বুকে জাপ্টে নয়, হাতের মুঠোয়।

গৌরীমায়া চমকে উঠেছিল। হাত ছাড়িয়ে পালাবার জন্যে মুরগি যেমন ছট্ফট্ করে, তেমনি ক'রে ধড়ফড় করছিল যোগমায়া।

বচন সর্দার মুঠোটা জোর ক'রে যেন কবজির মধ্যে গোটা গৌরী-মায়াকেই ধরে ফেলল। বিশ্রী ইতর একটা গালাগাল দিল গৌরীমায়ার এই ছট্ফটানি দেখে।

হাত দিয়ে মুখটা চাপা দিতে দিতে বচন সর্দার হাসছিল আর বলছিল, 'প্রেমবাহাদুরকে এই পাখির ডাক ডাকার জন্যে পঞ্চাশটা টাকা দিতে হয়েছে। আরও পঞ্চাশ কিনা লাগবে এই মোট বইতে, গাড়ি-ঘোড়ার ভাড়া! তারপর না—'

গৌরীমায়া হঠাৎ তার ছট্ফটানি বন্ধ ক'রে কেমন যেন স্থির হয়ে গেল।

কানের কাছে রাত-পাখির ডাকটা এতদিন পরে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। গৌরীমায়া চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে ঝাপসা জ্যোৎস্নায় কাউকে যেন দেখবার চেষ্টা করছিল।

প্রথম কান্না

সেই বোধ হয় প্রথম আমরা এক নতুন রকমের চুপিচুপি-কান্না কাঁদতে শিখলাম। আর জানলাম, আমাদের ওইটুকু সব বুকে এত নিশ্বাস আছে—আড়ালে আড়ালে দিনরাত ফেলেও যা ফুরোয় না, ফুরোবার নয়। সেই প্রথম বুঝলাম, মন-খারাপ কাকে বলে। হ্যাঁ, তেমনি মন-খারাপ—যাতে মন গুমরে গুমরে ওঠে, হু-হু করে, কি যেন ধরার জন্যে হাতড়ায় অথচ হাতে পায় না, ধরতে পারে না। আমরা যখন এই নতুন রকমের কান্না কাঁদতে শিখলাম, তখন আমাদের বয়স কত? চোদ্দ-পনর বড় জোর। কুলটি স্কুলের ক্লাস টেনের ছেলে তখন আমরা। ক'টি বাঁদর ছেলে।. বিড়ি-সিগারেট দু-একটা ফুঁকতে শিখেছি, চুল ওল্টাতে আর ফের্‌তা দিয়ে কাপড় পরতেও। সেই সময় আমাদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। এর আগে আর কারও তেমন ভাগ্য হয় নি; পরেও হল না। কেননা, আমরা চলে আসার পর কুলটি স্কুলের সেই বোর্ডিং—আসলে যা বোর্ডিংই নয়, আমরা যাকে বলতুম সপ্তর্ষি-মণ্ডল—আহা, সেই মণ্ডল—সাতটি ছেলের সেই সুখের স্বর্গ—ভেঙে গিয়েছিল।

আমাদের সেই সপ্তর্ষিমণ্ডলের কথা মনে পড়লে আজও চোখের সামনে সব ভেসে ওঠে—গোটা ছবিটাই। আমরা সাতটি ছেলে আর পাঁচজন স্যার—পণ্ডিতমশাই, ড্রিল স্যার, ড্রইং স্যার রতনবাবু, ত্রিবেদীজি—এই বারজন গুরুশিষ্য মিলে সেই বাড়িটায় থাকতুম—যে বাড়িতে একটা

কদম-ফুলের গাছ ছিল বলে বলাইদা বলত, 'বোর্ডিং নয়, কদম্বকানন।' বোর্ডিং সত্যিই নয় ; তেমন নাম দেওয়াও যায় না ! আসলে একটা চার-কুঠুরির বাড়ি। বাবুপাড়ার মধ্যে, মাইনর গার্লস স্কুলের ধবধবে ছোট্ট বাড়িটার ফেন্সিংএর গা ঘেঁসেই প্রায়। বলতে কি, নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে কোম্পানি তার বাবু-কোআর্টার্সের পুরনো বাড়িতে আমাদের থাকতে দিয়েছিল ; নয়তো আমরা বাইরের ক'টি ছেলে কুল্‌টি স্কুলে পড়ি না-পড়ি, থাকি না-থাকি, তাতে কিছু যেত-আসত না।

সেই পুরনো বাড়িতে বাবুপাড়ার মধ্যে আমরা কিন্তু বেশ ছিলাম. আমরা সাতটি ছেলে—আমি, মায়া, নিতাই, বাসুদেব, আর অন্যরাও। আমি টেনের, মায়া নাইনের, নিতাই আর বাসু এইটের ছাত্র, বাকি তিনজনের কেউ সেভেন, কেউ সিক্সে পড়ত। মনে পড়ছে, কখনও কোনদিন যদি বেশ বেলা হয়ে যাবার পরও আমরা না উঠতুম, ড্রিল স্যার কড়া বাজিয়ে সুর ক'রে ডাকতেন, 'সাত ভাই চম্পা ওঠ রে।'

মায়ার ফুল হবার সাধ ছিল না। সে তারা ভালবাসত। মাটি নয়, আকাশ। তাই ও নাম দিয়েছিল সপ্তর্ষিমণ্ডল। নামটা শুনলেই বেশ একটা স্বর্গ-স্বর্গ ভাব আসত।

আমাদের সেই স্বর্গের ছাদ ছিল খাপরা-ছাওয়া ; তার তলায় ছিল চুনকাম-করা চটের সিলিং। সে সিলিং কোথাও ছিঁড়েছিল, কোথাও ঝুলছিল। টিকটিকি লাফিয়ে পড়ত ফাঁকফোকর থেকে। তবু আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, খুশী ছিলাম। দড়ির খাটিয়ায়, কি মচকানো তক্তপোশে শুয়ে শুয়ে দিব্যি কোরাস গাইতাম, এমন বোর্ডিং কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি ! আর মাঝে মাঝে, বিশেষ ক'রে বর্ষায়, অর্ধেক আলকাতরা-ধরানো দেওয়ালের এ-ফাটল সে-ফাটলে কাগজ-ব্লটিং পুড়িয়ে ধোঁয়া

দিতাম। আমাদের ঘরে আলো কতটুকু আসত, কতটুকু বা হাওয়া, তার কথা কখনও ভাবি নি। ভাববার দরকার ছিল না। মাস্টার-মশাইরা অবশ্য প্রায়ই ঘরে ঢুকে জানলা খুলে দিতেন, ছেঁড়া নোংরা জামাকাপড় বাইরে বারান্দায় ছুঁড়ে ফেলে দিতেন, নন্দকিশোরকে দিয়ে ঝুলটুল ঝাড়িয়ে আমাদের ভব্য করবার চেষ্টা করতেন, ধমক দিতেন, স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ শোনাতেন। কে শুনত সেসব! কেউ না। স্বাস্থ্য আমাদের ভালই থাকত যে! বেহারি ঠাকুরের রান্না, আর কুলটি কারখানার ধুলো খেয়ে খেয়ে বেশ নধর কালো চেহারা হচ্ছিল আমাদের। জল-পাওয়া কচি গাছের মতন আমরা যে তখন তরতর ক'রে বাড়ছি!

এই বাড়ার বয়সেই সেই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। আমরা অন্য এক-রকম চুপিচুপি-কান্না কাঁদতে শিখলাম।

সেই পুজোয়, পুজোর ছুটিতে ঘটনাটা ঘটল। ছুটির মুখে-মুখেই হেড মাস্টারমশাই বলে দিয়েছিলেন, ক্লাস টেনের ছেলেরা মাত্র দিন দশেক ছুটি পাবে। লক্ষ্মীপূর্ণিমা পর্যন্ত। তারপর কোচিং ক্লাস শুরু হবে। ইংরেজী আর অঙ্কের। কেউ 'গরহাজির থাকতে পাবে না। যারা আসবে না, তারা যেন টেস্ট পরীক্ষার কথাটা মনে রেখো।

কথাটা আমাদের মনে যে ছিল না, তা নয়। তবে আর কেউ না হ'ক, বিপদে পড়লাম আমি। বাইরের ছেলে, বোর্ডিংএ থাকি ; ছুটির সঙ্গে সঙ্গে সবাই চলে যাবে—ছেলেরা, স্যাররা, ঠাকুর-চাকরও ; আমি থাকব কোথায়, খাব কি? থাকার ভাবনাও অবশ্য বড় ভাবনা নয়, বোর্ডিংএর চাবিটা নিয়ে নিলেই হবে! কিন্তু খাওয়া?

মায়া বললে, 'কিচ্ছু ভাবিস না তুই! আমিও চলে আসব। দুজনে

গ্র্যাণ্ড থাকা যাবে ! পল্টুর বাবার হোটেলে খাব ক'দিন। আমাদের কন্‌সেসন রেট্। আট আনায় দু-বেলা খাইয়ে দেবে।'

আমি বললাম, 'তুই তো নাইনের ! তুই আসবি কেন ? তারপর হেড মাস্টারমশাই জানতে পারলে—'

'কিচ্ছু হবে না ! আমি ভূতনাথ দি গ্রেটের কাছে পড়ছি না আজকাল ! ভুতুবাবু তো পড়াবেন, আমি পড়তে আসছি—কার কি বলার আছে !' মায়া বললে।

ঠিক হল, তাই হবে। আমি লক্ষ্মীপূর্ণিমার পরের দিন আসব। মায়াও আসবে। আর বোর্ডিংএর চাবি তো নিমাইদের বাড়িতে থাকেই ! এক ডাকের পাল্লায় সে বাড়ি। জানলা খুললে নিমাইকে দেখা যায়। গোলগাল চেহারাটা দুলিয়ে দুলিয়ে টেবলে ঝুঁকে পড়ে চিৎকার ক'রে 'জন গিলপিন' পড়ছে। তার সুরেলা পড়া আমরা শুনতে পেতাম। আমাদের বন্ধু সে। একসঙ্গেই পড়ি।

ছুটি হল। আমরা চলে গেলাম। স্যাররা চলে গেলেন। ঠাকুর-চাকরও। বোর্ডিংএ তালা পড়ল।

ফিরলাম পূর্ণিমার পরের দিনই। বিকেলের গাড়িতে।

স্টেশনের পথ দিয়ে আসছি। বরফকলের কাছে দেখা। বলাইদা আর মায়া। বলাইদা একটু গলা ঝুঁকিয়ে স্বভাবমত সরু গলায় এক দমকা হেসে নিল। মায়ার উস্কো-খুস্কো রুক্ষ চুল। মুখ শুকনো।

বলাইদা বললে, 'যাচ্ছিস কোথায় ? কদম্বকাননে আর ঢুকতে হবে না ! সন্ধ্যের শাট্‌লে ধানবাদ ফিরে যা।'

'কেন ?'

'ত্রিবেদীজি মাইরি বউ নিয়ে এসেছে।' মায়া হতাশ সুরে বললে।

'বউ ?' আমি অবাক।

বলাইদা রগড় পেয়ে তখনও হাসছে। বললে, 'হ্যা রে শালা, বউ। তোদের ঘর-টর এখন ত্রিবেদীজি অকুপাই ক'রে রয়েছে। ভেতরের দিকটা পুরোই। ভেতর থেকে খিল দেওয়া। মায়াটা বেলা একটার সময় এসেছে—তখন থেকে টো টো ক'রে ঘুরছে।'

মায়া বললে, 'সত্যি, ভাই! কোন সকালে গাড়িতে উঠেছি। চান, খাওয়া-দাওয়া—কিচ্ছু হয় নি।'

গলা দিয়ে স্বর ফুটছিল না। রাস্তায় বসে পড়ার যোগাড়। বরফকলের ফেন্সিংএর তারে গা হেলিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলাম। তারপর শুধালাম মায়াকে, 'তুই কড়া নেড়ে ত্রিবেদীজিকে ডাকলি না কেন?'

'ত্রিবেদীজি থাকলে তো?'

'নেই?'

'না, আসানসোল গিয়েছে।' মায়া বলাইদার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলে।

বলাইদা মাথা নাড়ল। গলার হাসিটা তখন মুখে এসে থেমেছে। বললে, 'সন্ধ্যে পর্যন্ত এখন চক্কর মার। ত্রিবেদীজি ফিরুক—তারপর ব্যবস্থা হবে। নে, চ—আমাদের বাড়িতে স্থুটকেস রেখে স্থয্যির দোকানে চা খেয়ে ঘুরে আসি।'

অগত্যা তাই। বলাইদা অর্থাৎ নিমাইদের বাড়িতে মায়ার স্থুটকেসের পাশে আমার স্থুটকেস রেখে সামনের কলে মুখ ধুয়ে নিলাম। নিমাইএর ফুলো চেহারা হাসির গমকে আরও ফুলে ফুলে উঠছিল। নিমাই বলাইদাকে বললে, 'তুই ঠিক জানিস, দাদা—ত্রিবেদীজি আসান-সোল গেছে? আমি তো শুনলাম, অণ্ডাল যাবে শালীকে আনতে।'

আমরা কেউই জানতাম না, ত্রিবেদীজির শ্বশুরবাড়ি কোথায়—অণ্ডাল, না আরা? তার শ্বশুর-শাশুড়ি শালা-শালী আছে কি, না আছে?

ত্রিবেদীজির বউ আছে, এই কি আমরা জানতাম ! না, কোনদিন ভেবেছি, সেই বউ আমাদের এই বোর্ডিংএর ঘরে এসে উঠবে !

বলাইদা বললে, 'ঘাবড়াস না। সন্ধ্যের সময়ও ত্রিবেদীজি না ফিরলে আমি পাঁচিল টপকে উঠে ভেতরের খিল খুলে দেব।'

শুনে আমাদের মুখ আরও শুকিয়ে গেল। বলাইদা অমনি ছেলে। তার অসাধ্য কাজ নেই। সত্যিই হয়তো পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকবে।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'থাক, বলাইদা। তোমায় পাঁচিল টপকাতে হবে না। ত্রিবেদীজির বউ হিন্দুস্থানী মেয়ে—গাঁইয়া-টাঁইয়া হবে। ভয় পেয়ে অ্যায়সা চিৎকার জুড়ে দেবে, হয়তো—'

নিমাই আমায় কথা শেষ করতে না দিয়েই বললে, 'মাইরি, একেবারে গাঁইয়াই ! সেই কবে এসেছে—তোরা যাবার দু-চার দিন পরেই—আজ পর্যন্ত একবার দেখতে পেলুম না ! সারা দিনই দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে বসে থাকে। ভূত—এক্কেবারে ভূত !'

মায়া শুধরে দিয়ে বললে, 'ভূত নয়, ভূতিনী। হিন্দীতে বোধ হয় ভূতনী হয়।'

আমরা হাসলুম।

সন্ধ্যেবেলায় ত্রিবেদীজিকে দেখতে পেলাম। আমরা নিমাইদের বাড়ির সামনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছি, ত্রিবেদীজি ফিরছিলেন। পোঁটলা-পুঁটলি হাতে ঝুলিয়ে। একাই। হ্যাঁ, আসানসোলেই গিয়েছিলেন। সওদা করতে।

নমস্কার ঠুকে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ত্রিবেদীজি অবাক।

'আরে তু—কমলা ? কাঁহাসে ?' ত্রিবেদীজি মানুষটা মোটাসোটা হলেও গলাটি ছিল সরু, চিকন, খুব মিষ্টি।

হেড মাস্টারমশাইএর কোচিং ক্লাসের কথাটা বলতেই ত্রিবেদীজি

সব বুঝতে পারলেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'হুঁ-হুঁ, ঠিক বাত! ইম্‌পরটেণ্ট চিজ্‌! ভাল কাজ করেছিস। আমার তো রে কমলা খেয়ালই ছিল না!' ত্রিবেদীজি হাঁটতে লাগলেন, 'অন্দরকে গিয়েছিস? যাস নি? ঘুরছিস-ফিরছিস দুপহার থেকে? কিয়া বুদ্ধু ছেলে রে তোরা! চল, চল!' ত্রিবেদীজির এই হিন্দী-বাংলা মেশানো কথার অদ্ভুত এক সুর ছিল। শুনতে আমার খুব ভাল লাগত। খুব।

অবশ্য অন্দরে সত্যই আমরা ঢুকলাম না। বাইরের দিকের ছোটমতন ঘরটা—যেটাতে ত্রিবেদীজি আর পণ্ডিত মশাই থাকতেন—সেই ঘরটা খুলিয়ে নিলুম। বললুম, 'এই বাইরের ঘরটাই ভাল, স্যার! আমি আর মায়া বেশ থাকতে পারব। তক্তপোশ তো আছেই একটা—আমাদের একটা বিছানা, আর বইগুলো ভেতর থেকে নিয়ে এলেই হবে!'

ত্রিবেদীজির আপত্তি করার কারণ ছিল না। সায় দিলেন খুশী হয়েই। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কোচিং ক্লাসটাই তো সব নয়! এই টানা ছুটিতে নির্ভাবনায় আড্ডা মারব, তাশ খেলব, বিড়ি-সিগারেট ফুঁকব, কত কি কেলেঙ্কারি করব—গুরুপত্নীর চোখের সামনে তো সেসব করা যায় না! দেখলেই তো কুটুর-কুটুর ক'রে ত্রিবেদীজিকে লাগাবে! তার চেয়ে বাইরের ঘরই ভাল। কোন সম্পর্ক থাকল না অন্দরের সঙ্গে। এক কুঁজো খাবার জল রাস্তার কল থেকে নিয়ে নেব। স্নান করব কারখানার ফোয়ারা-পুকুরে। খাব পল্টুর বাবার হোটেলে। ব্যাস, আর চিন্তার থাকল কি!

সেই রাত্রে আমরা ঘর-টর গুছিয়ে নেবার পর তক্তপোশে চিতপাত হয়ে শুয়ে ভাগাভাগি ক'রে সিগারেট ফুঁকছি—আমি, মায়া, আর বলাইদা—হঠাৎ খুট্ ক'রে পশ্চিম দেওয়ালের জানলাটা খুলে গেল। সিগারেট

ফেলে তড়াক ক'রে উঠে বসলাম। হ্যারিকেনে তেমন তেল ছিল না। মিটমিটে আলোয় দেখলাম ত্রিবেদজি।

'এই কমলা, রোটি লিয়ে যা। তুই তো রোটি খাস রে রাতমে! মায়া সেণ্ট পার্সেণ্ট বাঙালী। রাতমে ভি ভাত খায়! আরে বাবা, একদিন আর কি হোবে! রোটি, বুটের ডাল, ভাজি খেয়ে লে। আ, লে যা।'

নিমন্ত্রণটা অপ্রত্যাশিত। মাথা চুলকে বললাম, 'স্যার, আমরা যে হোটেলে বলে এসেছি!'

'হোট্‌ল ? কোন্ হোট্‌ল ?'

'পল্টুদের।'

ত্রিবেদীজি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন চুপ ক'রে। বললেন, 'তব্ তো ওরা চার্জ করবে! ঠিক হ্যায়—যা, তব্ খেয়ে লিগে যা।' জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে ত্রিবেদীজি সরে গেলেন। ও পাশ থেকে জানলার ছিট-কিনি লাগাবার শব্দ শুনতে পেলাম।

বলাইদা বললে, 'এই জানলাটাই যা ঠেলা রেবে তোদের! যখন-তখন গলা বাড়াবে ত্রিবেদীজি। ছিটকিনিটা শালা যদি এ দিকটায় থাকত, এঁটে দিয়ে বসে থাকতিস।'

সত্যি, ওই জানলাটাই যা অন্দরের সঙ্গে বাইরের যোগসূত্র! বন্ধ ক'রে দিতে পারলে ঝঞ্ঝাট চুকত।

বন্ধ করার একটা প্ল্যানও পরের দিন সকালে বলাইদা দিয়েছিল। আমরাও রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্যিস বন্ধ করি নি! করলে যে কি হারাতাম, তা বুঝলাম সন্ধ্যেবেলায়। যখন কদমগাছের পাতা হাওয়ায় কাঁপছিল, দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠি-উঠি করছে, কুলটি কারখানার স্ল্যাক্ ঢালার আগুনে উত্তর আকাশটা থেকে থেকে আলো হয়ে উঠছিল,

আর আমরা লণ্ঠনের আলোয় গোল হয়ে বসে মুড়ির সঙ্গে চিনেবাদাম চিবোচ্ছিলাম, তুলসী বাঁশি বাজাচ্ছিল এক কোণে বসে—তখন। তখন খুট্‌ ক'রে সেই জানলা খুলে গেল। এত ধীরে যে, আমরা টেরই পাই নি। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেতে গিয়ে মায়াই প্রথমে দেখল। দেখেও যদি হতভাগা চুপ ক'রে থাকত, সে অন্য কথা হত। কিন্তু জলের ঢোঁক গলায় রেখেই অদ্ভুত এক শব্দ ক'রে ও আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে চাইল জানলায়। ততক্ষণ বিষম খেয়েছে মায়া। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার যোগাড় তার। আমরাও জানলার দিকে একসঙ্গে তাকিয়েছি সবাই ততক্ষণে। ও-দিক থেকে একটা আশ্চর্য তরল খিলখিল হাসি যেন জানলা দিয়ে ফোয়ারার মত আমাদের এই ছোট্ট আধ-অন্ধকারে ঘরে কেউ ছিটিয়ে দিল।

আমরা কি স্বপ্ন দেখছিলাম! কিংবা সিনেমার কোন সুন্দর ছবি! আট-দশ জোড়া চোখ তখনও ধাঁধাঁ খেয়ে চুপ ক'রে আছে। জানলার ও-পাশ থেকে সেই চিকন তরল হাসি তখনও গমকে গমকে ভেঙে পড়ছে।

এর পর আমরা সকলেই না জেনে, না বুঝে জানলার দিকে চেয়ে বোকার মতন, মূর্খের মতন এবং ক্যাবলার মতন একসঙ্গে বিচিত্র সুরে হেসে উঠলাম। নিজেদের কানেই সেই হাসি অদ্ভুত শোনাল।

হাসি থামল ও-পাশ এবং এ-পাশেরও। বলাই কোন্‌ ফাঁকে চুপিচুপি লণ্ঠনের সলতেটা যতটা পারে বাড়িয়ে দিয়েছে। শিস উঠছিল। আমরা কেউই তা দেখি নি। আমরা দেখছিলাম, আলোটা হঠাৎ ঘর-ভরা হয়ে গেছে। আর জানলার ও-পাশে বুক-গলা একটু হেলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক মেয়ে। এমন মেয়ে আমরা আর দেখি নি। রোদ-ভরা ধানের মত রং, টিকলো নাক, একটু বা লম্বা-গঠন মুখ, গালের পাশে

হাসি-খুশির ঢল, নাকে নাকছাবি, কানে ফুল। সেই মেয়ের মাথার দু পাশে এক থাবা ক'রে চুল এগিয়ে এসে কপাল ঢেকেছে। সিঁথিতে মেটে রঙের চওড়া সিঁদুর। গলার পাশ দিয়ে লম্বা সাপের মত বিনুনিটা বুকের ওপর টেনে নিয়েছে। গলায় সুতলি-বাঁধা কেমন এক হার। হলুদ রঙের শাড়ি পরনে; টকটকে লাল নকশা-কাটা পাড় কেমন যেন অন্যভাবে বেড় দিয়ে উঠেছে। ঘোমটা-মতন কিছু একটা আছে কি না-আছে—ভাল ক'রে চোখ পড়ছিল না আমাদের। ওই মেয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। লণ্ঠনের খানিক আলো তার চোখের তলা, চোখের পাতা, এমন কি কাঁচের মত ঝকঝকে দুটো তারা ভিজিয়ে রেখেছিল।

আমরা অপলকে তাই দেখছিলাম।

হঠাৎ নধর-গড়ন একটি হাত জানলার কাঠের গরাদের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল। সেই হাতে গলার আর কাঁচের চুড়ি যেন চুমকি কাটছিল। আমরা যখন হাত দেখছি সবাই ফ্যালফ্যাল ক'রে, তখন হাতের অধি-কারিণী কথা বললে। চিকন, মিহি স্বর।

কথাটা শুনতে পেলুম, বুঝতে পারলুম না। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম পরস্পরের। নিজেদের মধ্যে অস্পষ্ট স্বরে ফিসফাস করলাম। 'কি বলছে রে? কাকে বললে? চাইছে নাকি কিছু? কি চাইছে?'

আমরা যখন বিমূঢ় বিহ্বল, আবার কথা বললে সেই মেয়ে। এবার আঙুল দিয়ে স্পষ্ট ক'রে ইসারা ক'রে।

লণ্ঠনের কাঁচটা কালো হয়ে গেছে। বাড়ন্ত পলতের দাউদাউ শিস উঠে চিড় খেয়েছে। এবার চিড় ধরে ফাটল। শব্দ ক'রেই।

আমরা সবাই লণ্ঠনের পলতেটা কমাবার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। মাথা ঠুকে গেল মায়ার, চশমা পড়ে গেল আমার, বলাইদা তপ্ত কাঁচের ছ্যাঁকা খেয়ে 'উঃ' ক'রে উঠল। আর, হুড়োহুড়ি-তাড়াতাড়িতে পলতে

কমাতে গিয়ে আমরা লণ্ঠনটা নিভিয়ে ফেললাম। এক দমকা হাওয়ার মত এক-ঘর অন্ধকার হুস ক'রে কোথা দিয়ে যেন ঢুকে পড়ল।

জানলার ও-পাশ থেকে আর এক পশলা হাসি ছিটিয়ে পড়ল এ ঘরে, অন্ধকারে।

আবার যখন বাতি জ্বলল, সবাই আকুল হয়ে তাকালাম। জানলা বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে। কেউ নেই।

অনেকক্ষণ আমরা আর কথা বলতে পারি নি সেই রাত্রে। কে জানত, কেই বা আশা করতে পেরেছিল—কখনও, কোনদিন কুলটি স্কুলের সেই ভাঙা, ফুটো, আলকাতরার গন্ধ-ওঠা বোর্ডিংএ টিকটিকি-আরশোলা-উই-ইঁদুরের মধ্যে এক পাখি—হ্যাঁ, পাখিই—হঠাৎ উড়ে এসে ঘর বাঁধতে বসবে। আমরা ভাবি নি কখনও। ঘটনাটা যখন ঘটল, অভিভূত হয়ে পড়লাম।

মায়া বললে, 'ছি-ছি, নিমাইটার কাণ্ড দেখলি! এমন সুন্দর মেয়ে—একে ভূত, গাঁইয়া, যা খুশি তাই বলে দিয়েছিল! আমরাও তো তাই ভেবে নিয়েছিলুম!'

বলাইদা কড়িকাঠের দিকে মুখ তুলে চোখ বুজে সিগারেট ফুঁকছিল। বললে, 'তুইও তো শালা একেবারে ব্যাকরণ-দিগ্‌গজের মত জেণ্ডার রপ্ত ক'রে বলে দিলি ভূতিনী—হিন্দীতে ভূতনী!'

মায়া জিভ কাটল।

তুলসী বললে, 'নামটা আমরা আর এক চান্সে বের ক'রে নেব।'

ত্রিবেদীজির বউএর নাম-ধাম জানতে আমাদের দেরি হল না। ওর নাম সুমিত্রা। অবশ্য নামের মালিকের উচ্চারণে শব্দটা আরও মোলায়েম হয়ে দাঁড়ায় সুমিত্‌রা। গয়া জেলার কোথায় যেন বাড়ি। বিয়ে হয়েছে

দু বছর আগে। এই প্রথম বাপের বাড়ি ছেড়ে ত্রিবেদীজির সঙ্গে স্বামীর ঘর করতে আসা।

গুরুপত্নীকে আমরা এত কথা কি জিজ্ঞেস করতে পারি! পারি না। সেই বয়সেও আমাদের এ জ্ঞান ছিল। কিন্তু আমাদের প্রশ্নের অপেক্ষা সুমিত্রা রাখে নি। নিজেই গড়গড় ক'রে কি কথায়, কোন প্রসঙ্গে সব বলে দিয়েছিল। হ্যাঁ, আমাদের ভাব জমতে দেরি হয় নি। পুরো তিনটে দিনও লেগেছে কিনা, সন্দেহ! সকালে মাঝে মাঝে, আর সারা সন্ধ্যেই বলতে হয়, সুমিত্রা জানলা খুলে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে গল্প করত। আমাদের দেখত। হাব-ভাব, চাল-চলন, কথাবার্তা শুনত—আর কখনও হাসত, কখনও কৌতূহল প্রকাশ করত, কখনও হরেক রকম প্রশ্ন করত।

আমরা বুঝতে পারতাম, সারাটা দিনই প্রায় এই অল্পবয়সী বিদেশী মেয়েটির সময় কাটে না একা-একা। ত্রিবেদীজি সকালে টিউশনি করেন আশেপাশে, আর বিকেলে বেরোন কুলটি-হাটের এক মারোয়াড়ী ছেলেকে পড়াতে। সেখান থেকে যান বরাকরে। ব্রিজনন্দনকে জ্ঞান বিলোতে। ফিরতে ফিরতে তাঁর রাত নটা-দশটা বাজে। এতক্ষণ—এই দীর্ঘ সময়—বেচারি সুমিত্রা কাটায় কি ক'রে একা-একা মুখটি বুজে, মড়ার মত হয়ে! বোবা-কালা-অন্ধ হলে না-হয় কথা ছিল ; কিন্তু অমন জীবন্ত, চঞ্চল, আমাদেরই সমবয়সী একটি মেয়ে কোন দুঃখে এমন চমৎকার সঙ্গ ছেড়ে জানলা বন্ধ ক'রে থাকবে!

ভাব না হলেই বরং আশ্চর্য হবার ছিল। কারণ, সুমিত্রাকে আমাদের ভাল লাগত। আমরা ওর মুখের দিকে চেয়ে, ওর কথাবার্তা আর হাসি শুনেই বুঝেছিলাম, আমরা সবাই প্রায় একই বয়সের সামান্য আগুপিছু হয়ে রয়েছি। আমাদের মতনই ও চঞ্চল, খোলামেলা মনের মানুষ—সরল, আমুদে, প্রাণবন্ত। আর সুমিত্রা বুঝতে পেরেছিল, এই ক'টি বাঁদরের

জ্ঞানগম্যি তারই মতন। কেতাব পড়লেও আসলে এরা ক'টা হাসি-হুল্লোড়-আবেগ-আবেশে-ভরা কিশোর।

সুমিত্রাকে কি বলে ডাকব, এই নিয়ে একদিন আমাদের মধ্যে বচসা বেধে গেল। আমাদের অমর—কালো বেঁটে ভীমের গদার মত চেহারা যার, স্টেশনের কাছে কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে যে থাকত, খুব বন্ধু আমাদের—সে বললে, 'কেন, মাজি বলে!'

বলাইদা তেড়ে উঠল। 'মাজি কেন? আমরা কি চাকর নাকি?'

তুলসী বললে, 'মাজি মানে মা। সুমিত্রা আমাদের মা হবে কি ক'রে রে!'

গুরুপত্নীর বয়স কি দেহের অনুপাতটা যে ধর্তব্যই নয়, অমর সে কথাটা বুঝোবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'গুরুপত্নী যখন, তখন মা।'

আমরা কেউ তা স্বীকার ক'রে নিতে পারলাম না। নিতে ইচ্ছেই হচ্ছিল না।

মায়া প্রস্তাব করলে, 'তার চেয়ে বহুজি ডাকটা অনেক সুন্দর, ভদ্র।'

হ্যাঁ, ডাকটা অবশ্য মন্দের ভাল! কিন্তু আমরা কি ছাই হিন্দী জানি! বউ আবার জি হয় কি ক'রে, বুঝতে পারছিলুম না।

শেষ পর্যন্ত সুমিত্রাই সমস্যাটার সমাধান ক'রে দিলে। বললে, জিভ-ঠোঁটে একরকম সান্ত্বনার শব্দ ক'রে, 'ভালা। আচ্ছি ডাক্। সুন্‌দর!'

সুমিত্রার বাংলা উচ্চারণ শুনে আমরা হাসলাম। এত মিষ্টি লাগছিল!

লজ্জা পেয়ে ভ্রূ কুঁচকে সুমিত্রা বললে, 'ভাগ! হাসনে কি কিয়া মিলা?'

মায়া বললে, 'ভালা নয়, বহুজি—ভা···লো। সুন্—দর নয়, সুন্দর।'

সুমিত্রা ঝগড়া শুরু করল। 'তোমাদের বাংলায় খালি ও আর ও। যত সব বিদঘুটে শব্দ! বাঙালীদের জিভ সাপের মত হিসহিস করতে পারে কিনা—তাই যতসব বিশ্রী-বিশ্রী উচ্চারণ! তোমরা বল তো, মোমফালি কাকে বলে? পারলে না! বয়েল মানে কি? ধ্যুত! কুছ কামকা নেহি!'

কাজের না হলেও অকাজ করতে পারি আমরা। সুমিত্রাকে বললাম, 'তোমরা বড় ভাইএর বউকে কি বল? পিসি-মাসির হিন্দী কি? এ স্লাই ফক্স মেট্ এ হেন-এর হিন্দী বল!'

সত্যি কথা, নিছক জ্বালাতন করা বই এসব প্রশ্ন আর কিছুর জন্যে নয়। তবু এ কথাও ঠিক—জ্বালাতনেই সব শেষ হত না। সুমিত্রার কাছ থেকে আমরা নানারকম হিন্দী শব্দ শিখতাম। তার বদলে সুমিত্রা শিখত আমাদের কাছে বাংলা শব্দ। হিন্দী রান্নার তার শেখাত সুমিত্রা। দহিবড়া তৈরি ক'রে খাওয়াত। বলত, 'বাঙালীরা খালি শক্কর খেতে জানে—আর জানে মছলি খেতে! তোমরা কখনও ভাল ঘিউ, দুধ খেয়েছ?'

আমরা জবাব দিতাম, 'যাও, যাও—গয়াবলি! তোমার তিলকুটের চেয়ে আমাদের ল্যাংচা ভাল! ল্যাংচা খেয়েছ কখনও? সীতাভোগ দেখেছ কখনও চোখে?'

সুমিত্রা কলা দেখিয়ে বলত, 'এটা খেয়েছ কখনও?'

আমরা হেসে উঠতাম সবাই একসঙ্গে। তারপর সুখ্যি ময়রার হাতে-পায়ে ধরে একদিন ল্যাংচা তৈরি করিয়ে আনিয়ে সুমিত্রাকে খাওয়ালাম। সুমিত্রা বললে, 'বাঃ—খুব সুন্দর!' সুমিত্রা একদিন আমাদের ভাল পরটা ক'রে খাওয়ালে। আমরা বললাম, 'ফার্স্ট ক্লাস!'

সুমিত্রার ভীষণ ইচ্ছে—ও বাঙালী মেয়েদের মতন ক'রে একদিন খোঁপা

বেঁধে শাড়ি পরে বেড়াতে বেরুবে। মহাসমস্যায় পড়া গেল! খোঁপা বাঁধার আমরা কি জানি! শাড়ি পরার কোঁচন-কাঁচন—তারই বা বুঝি কি!

অমর বলল, 'ভাবিস না। আমি আমার মাধুরীদির কাছ থেকে চুল বাঁধা শিখে আসব।

বলাইদা বললে, 'একটা যদি শিখিস, অন্যটাই বা না কেন? শাড়ি পরাটাও শিখে আসবি।'

অমর গোল-গোল চোখে তাকিয়ে বললে, 'য্যা!'

'য্যা নয়, ভাল ক'রে শিখে আসবি, শালা! রিহার্সাল দিয়ে আসবি। নয়তো এ ঘরে ঢুকতে দেব না।'

তারপর সত্যিই একদিন আমরা ক'টা বাঁদর ছেলে সুমিত্রার ঘরে বসে তাকে বাঙালী ঢঙে চুল বাঁধাতে, খোঁপা তুলোতে বসলাম্। সে এক এলাহি কাণ্ড! আয়না, জল, চিরুনি, গামছা, কাঁটা। অমর একটা দড়ি যোগাড় ক'রে তাই দিয়ে বিছে-বিনুনির নক্শাটা বুঝোতে চেষ্টা করে, সুমিত্রা কিছুতেই রপ্ত করতে পারে না। যদি বা বিনুনি রপ্ত হল, খোঁপা আর ঠিক হয় না, সুমিত্রা মাথায় কাঁটা গুঁজতে পারে না। ঘণ্টা দেড়েক অবিশ্রাম চেষ্টার পর খোঁপাটা ঝুলল একরকম। এর পর শাড়ির পালা। অমর বলাইদার মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে একটা গামছা হাতে ক'রে পরার কায়দাটা বার কয়েক বুঝিয়ে দিলে। আমরা ঘরে চলে এলুম।

প্রায় আধঘণ্টাখানেক পরে জানলা খুলে সুমিত্রার মুখ ভেসে উঠল।

আমরা হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকলুম সবাই। কি সুন্দরই না মানিয়েছে সুমিত্রাকে! আনন্দে অমরটা একটা ডিগবাজি খেয়ে ফেলল।

কিন্তু এই সাজসজ্জার পর হবে কি? বাড়িতে বসে বসেই কি কাটবে এমন বিকেল আর সন্ধ্যে!

বলাইদা বললে, 'তোমায় নিয়ে আজ আমরা সিনেমায় যাব, বহুজি।'

সুমিত্রা পা বাড়িয়ে ছিল যেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজি। কিন্তু ত্রিবেদীজি? তিনি যদি চটে যান?

সুমিত্রা সে ভার নিল। বললে, 'তসবির আমি দেখি নি কভি। চলো।'

আমরা পাঁচজন—আমি, মায়া, বলাইদা, তুলসী, অমর—সে এক-রকম প্রসেসন ক'রে রাস্তা দিয়ে সুমিত্রাকে নিয়ে চললাম। বুক ফুলিয়ে, ডগমগ করতে করতে। জি টি রোডের পাশে মাঠে টিনের-ছাউনি সিনেমা। কাছেই। রাস্তা ফুরিয়ে গেল। তখন ভাবছিলুম, এ রাস্তাটা আরও দূর কেন হল না!

এই অকালে একদিন বৃষ্টি নামল। সকাল থেকেই ঝিরঝির বৃষ্টি। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। কোচিং ক্লাসে গেলাম না। সারাটা দুপুর ভরে বোর্ডিংএর খাটে শুয়ে তাশ খেললাম। তারপর বিকেল হতেই হুজুগ বাধালাম খিচুড়ি রান্নার।

স্টোভ ধরেও ধরে না। স্টোভ ধরল তো একদফা চা হল। তারপর খিচুড়ির হাঁড়ি চাপল। বাহাদুরি বলতে হবে অমরের—পিণ্ডি চট্‌কানোর মতন চালডাল চটকে প্রায় ফুটন্ত জলে সব ফেলে দিয়ে বললে, 'আধ ঘণ্টা! ব্যাস, তারপর রেডি হয়ে যাবে।'

আধ ঘণ্টা তো ছার, ঘণ্টাখানেক কেটে গেল—না উঠল গন্ধ, না দানা বাঁধল চালডাল। লণ্ঠন নিয়ে যতবার দেখি, সাদা লেইএর মত কি একটা যেন ভুড়ভুড়ি কেটে ফুটছে।

সুমিত্রা জানলা খুলে ক'বারই অসম্ভব কৌতূহল নিয়ে শুধিয়েছে, 'কিয়া পাকাতা হ্যায়? খিচড়ি?'

আমরা মাথা নেড়ে নেড়ে বলেছি, 'হ্যাঁ, বহুজি। মুসুর ডাল কা খিচুড়ি। দাঁড়াও, হাঁড়িটা একবার নামুক! গন্ধে তোমার জিভ দিয়ে জল গড়াবে।'

কিন্তু হাঁড়ি আর নামে না। সাড়ে আটটা বেজে গেল। এক বিন্দু যদি গন্ধ বেরোয়!

সুমিত্রা—এবার জানলা দিয়ে নয়—ঐ বৃষ্টিতে দরজা খুলে বাইরে দিয়ে আমাদের ঘরে এসে ঢুকল। লণ্ঠন তুলে নিয়ে দেখল হাঁড়ির অবস্থা। তারপর খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠল।

'কিচ্ছু হয় নি! হলদি দিয়েছ এক কাঁচ্চা—মিরচা কোথায়? নিমক? ঘিউ? ছো—ছো—ইয়ে কিতাব না হ্যায়, ভাই!'

এর পর সেই বৃষ্টিতে সুমিত্রা খিচুড়ি রাঁধতে বসল। নিজেই নিয়ে এল বাটা হলুদ, লঙ্কা, মায় তোলা উনুনটা পর্যন্ত।

আ! সে এক মধুর দৃশ্য! অপূর্ব! আগুনের গন্‌গনে আঁচ, লণ্ঠনের লালচে আলো; বাইরে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, কদমগাছের ডালপালার মাথা-কোটাকুটি—আর সুমিত্রা আমাদের মধ্যে বসে খিচুড়ি রাঁধছে। ওর মাথায় কাপড় নেই। আঁচ লেগে মুখটা টকটক্ করছে, একটু বুঝি ঘামও। তুলসী এরই মধ্যে বাঁশি বাজাচ্ছে থেমে থেমে। সুন্দর এক গন্ধ উঠছে হাঁড়ির মুখ থেকে। নাক টানছি সকলে, মায় সুমিত্রা

তারপর আমরা গোল হয়ে খেতে বসলুম। সুমিত্রাই পরিবেশন করল। আমরা বললুম, 'তুমি একটু খাও, বহুজি।'

বহুজি মাথা নাড়ল। না, এখন নয়—আজ নয়, অন্য একদিন।

সেই অন্য একদিন এল দেওয়ালিতে। সুমিত্রা আমাদের সঙ্গে মিলে-মিশে প্রদীপ সাজালে, ঠাকুর দেখে এল, ওর তৈরি-করা খাবার ভাগ ক'রে একসঙ্গে গোল হয়ে বসে সব খেলুম। তারপর কড়ি নিয়ে জুয়া খেললুম অনেক রাত পর্যন্ত। অদ্ভুত সেই জুয়ার বাজি। দোকানের সাজা পানের খিলির লেন-দেন—পয়সার নয়।

যখন সবাই ঘুমুতে যাচ্ছি—সুমিত্রা কথাটা বললে। কাল সে চলে যাবে।

আমরা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম, সুমিত্রা এ বোর্ডিংএর কেউ নয়, আমাদের কেউ নয়, এমন কি এই কুলটি শহরেরও।

বিছানায় শুতে এসে একটু-একটু ক'রে বুঝতে পারছিলাম। পরশু ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—পরের দিন স্কুল খুলবে। ছেলেরা সব ফিরে আসবে কেউ কালিপাহাড়ী, কেউ সালানপুর থেকে। মাস্টারমশাইরা এসে পড়বেন—কলকাতা, আর ঢাকা, আর বর্ধমান থেকে। বেহারি ঠাকুর আসবে, নন্দকিশোর আসবে। এ বোর্ডিংএর আবার সব ঘর, সব দরজা-জানলা খুলে যাবে। কিন্তু—

কিন্তু যা আর আসবে না, যে আর কোনদিন আসবে না—সেটা কি, সে কে? আমরা তা বুঝতে পারলুম পরের দিন বিকেলে। বাক্স, সুটকেস, পোঁটলা-পুঁটলি ঘাড়ে-বগলে ক'রে সুমিত্রা আর ত্রিবেদীজিকে কুলটি স্টেশনে পৌঁছে দিলাম আমরা পাঁচটি ছেলে। গাড়ি এল—গয়ার গাড়ি। সুমিত্রাকে নিয়ে ত্রিবেদীজি ট্রেনে উঠলেন। আমরা নিচে দাঁড়িয়ে। সুমিত্রা হাসি-হাসি মুখ করলেও ওর চোখ ছলছল করছিল। ভিতরে ভিতরে ও কাঁদছিল।

গাড়ি চলে গেল। যেমন এসেছিল, তেমনি। আর, আমরা পাঁচটি ছেলে চুপচাপ সেই স্ল্যাক্-ঢালা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, শিরীষ গাছের

ছায়ায় অন্ধকার পথ দিয়ে আসতে আসতে আনমনা হয়ে পড়ছিলাম, নিশ্বাস ফেলছিলাম ঘনঘন। মনে হচ্ছিল, কি যেন হারিয়ে গেছে। খুব কষ্ট হচ্ছিল। ভীষণ কষ্ট।

বোর্ডিংএ ফিরে এসে সেই খাটে আমরা পাঁচটি ছেলে পাঁচরকম ভঙ্গিতে শুয়ে পড়লাম। কেউ কারুকে মুখ না দেখিয়ে। আর, সন্ধ্যে হয়ে গেলেও ঘর যখন অন্ধকার ঘুটঘুটেই থাকল, তখন পাঁচজনই পাঁচ-জনকে না জানিয়ে গয়া জেলার সুমিত্রার জন্যে টপটপ ক'রে চোখের জল ফেলে চুপিচুপি কাঁদলাম।

সেই আমাদের প্রথম এক নতুন রকম কান্না কাঁদতে শেখা—আমাদের মধ্যে একজনের জন্যে, আমাদেরই এক অন্য ধরনের সঙ্গিনীর জন্যে, যাকে—আমরা জানতাম—আর কোনদিন দেখতে পাব না, যাকে নিয়ে এই ঘরে গোল হয়ে বসে আর কোনও দিন গল্প করতে পাব না।

যতক্ষণ না অফিসে যায় নবনী—তারপর রেণু একা, এ বাড়িতে। রোদ-তেতে-ওঠা বেলা এবং দুপুর—সারাটা দুপুর, বিকেলের ছায়া ঘন হওয়া পর্যন্ত একা-একাই কাটে ওর। নবনী তখন ফেরে।

এই সময়টা, সারা দিনই বলা যায়, এ বাড়ি চুপ—রিভারসাইড রোডের এই নিরিবিলি বাড়ি একরকম নিঝুম। রেণুর চলাফেরা, বিছানা ঝাড়া, ঘরদোর আবার ক'রে ঝাঁট দেওয়া, আর টুকিটাকি কাজ সারায় যতটুকু শব্দ—সে আর কতটুকু—রিভারসাইড রোডের গাছপালা-কাঁপানো হু-হু বাতাসে ডুবে যায়। পাখিদের কিচিরমিচিরও তো আছে! তবু থেকে থেকে আশ্চর্য রকম আরও কিছু শব্দ ফোটে। কুয়া থেকে জল তোলার সময় হুইলের কেমন একটানা সুর, স্নানের সময় রেণুর গা থেকে পায়ের কাছে মেঝেতে জল আছড়ে পড়ার ছর্‌ছর্, কিংবা ওর সেমিজ-ব্লাউজ কাচার, নবনীর গেঞ্জি-রুমালে সাবান দিয়ে আছড়ানোর থপথপ-থুপথুপ। আর এরই মাঝে মাঝে আচমকা বা খুব মিহি চিকন গলার মিষ্টি সুর, গানের গুন্‌গুন্।

এইসব শব্দ এমন নয়, এত কিছু বেশি নয়, যাতে রিভারসাইড রোডের এই ছোট্ট বাড়ির নিস্তব্ধতা নষ্ট হতে পারে। বাস্তবিক তা হয় না। তবু নবনী অফিস না বেরুনো পর্যন্ত এই ছোট্ট সংসারের কিছু মুখরতা আছে। কোন্ সকালে উনুন ধরিয়ে দেয় রেণু, রোদ তখনও উঠনে এসে পড়ে নি, গাছের পাতাতেই আটকে রয়েছে। বাসি কাপড়

ধুয়ে-টুয়ে চায়ের পাট সারতে বসে। রান্নাঘর থেকে নবনীকে ডেকে ডেকে হাল ছেড়ে দেয়। তারপর ঘরে গিয়ে ঠেলেঠুলে ঘুম ভাঙায় তার। চায়ের কাপ এগিয়ে দেয়। ঘরের সব ক'টা জানলা খুলে দিয়ে বলে, 'এত বেলা ক'রে উঠলে আর বাজারে যাবে কখন!' নবনী জানলা দিয়ে বাইরে রোদের দিকে একটু তাকিয়ে জবাব দেয়, 'এমন কি বেলা হয়েছে! তোমার ভাত হতে হতে আমি ফিরে আসব।' রেণু বাধা দেয়, 'থাক! এখন আর সাইক্‌ল্ ঘাড়ে ক'রে বাজারে ছুটে যাবার দরকার নেই। যা আছে, হয়ে যাবে।' নবনী কথাটা কানে তোলে না। সে তো আর পাঁচ মাইল দূরে বাজারে যাচ্ছে না—খানিকটা এগিয়ে বি এন আর ব্রিজের চড়াইএর মুখে যে ছুটকো বাজার বসে দেহাতীদের, সেখান থেকেই আলুটা-মাছটা নিয়ে আসবে!

'আসবে যদি, তবে যাও।' রেণু ভাতের আগে ডালের ব্যবস্থাটা চট ক'রে সেরে এসে ফর্দ দেয় মুখে মুখে, আর টাকা। থলেটা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।

নবনী সাইক্‌ল্ নিয়ে বেরিয়ে যায়।

দেখতে দেখতে নবনী ফিরে আসে। ততক্ষণে বাসি বিছানা তোলা শেষ হয়ে গেছে, এক দফা ঝাঁটপাট পড়ে গেছে ঘরে। বারান্দা-উঠনও বাদ পড়ে নি। কুয়া থেকে জল তুলে রান্নাঘরের কাছাকাছি একটা জায়গায় রেখে দিয়েছে রেণু। বাটনা পর্যন্ত বাটা শেষ। নবনী ফিরতেই আর এক দফা চা, সকালের একটু কিছু খাবার। তারপর রেণু দ্রুত ছন্দে কাজ ক'রে যায়। তরকারি-মাছ কোটাকুটি, ধোয়াধুয়ি। রান্নাঘরে হাতা-খুন্তির শব্দ আর থামে না!

নবনী বেতের মোড়াটা টেনে নিয়ে রান্নাঘরের সামনে উঠনে বসে। সামনে জলচৌকিতে আয়না, দাড়ি-কামানোর সাবান, ব্রাশ, সেফটি

রেজর, ব্লেড। রেণু এরই মধ্যে কখন একটু জল গরম ক'রে নিয়েছে। নবনীর সামনে জলচৌকিতে দাড়ি-কামানোর আংটা-ভাঙা কাপটায় জলটুকু ঢেলে দেয়।

জলটুকু ঠাণ্ডা হতে দিয়ে নবনী বলে, 'আমাদের জ্যোতিষ কি বলছিল, জান?'

রেণু কড়াইএ তেল দিয়ে মাছ ছাড়ছে তখন। বেশ শব্দ উঠছিল। সেই শব্দকে কি ক'রে যেন আয়ত্তে এনে বললে, 'কি?'

'বলছিল, ওদের নিউ কলোনিতে বাচ্চা মেয়েদের একটা স্কুল করেছে—খুব অল্পই মেয়ে, নিজেদের বাড়ির বউ-বোনরা গিয়ে পড়িয়ে আসে। আমায় বলছিল তোমার কথা।' নবনী আঙুল দিয়ে জলের উত্তাপটা পরখ ক'রে ব্রাশ ডুবিয়ে দিল।

'আমি তো বাচ্চা নই, আমায় ভরতি করবে কেন?' রেণু রান্নাঘরের আড়াল থেকে বললে; ঠোঁট টিপে হাসি চেপে।

'পড়তে বলে নি, পড়াতে বলেছে।' নবনী হেসে তার কথাটা আরও প্রাঞ্জল করলে। দাড়িতে সাবান লাগাতে লাগাতে আবার বললে, 'কথাটা কিন্তু মন্দ বলে নি। বলছিল ও, আমিও ভেবে দেখলুম—সত্যি, সারাটা দিনই তোমার একা-একা কাটে। এই আমি বেরিয়ে যাব, তারপর সন্ধ্যে পর্যন্ত তুমি একেবারেই একা! কথা বলার মতনও একটা লোক নেই। সময় কাটে কি ক'রে তোমার, কে জানে! আমি হলে পাগল হয়ে যেতুম।'

মাছের ঝোলটা চড়িয়ে দিয়ে রেণু এইবার বাইরে বেরিয়ে এসেছে। নবনীর সামনেই দাঁড়িয়ে। জল-হাতটা মুছতে মুছতে রেণু বললে, 'তোমরা হচ্ছ শহরের হৈ-হট্টগোল ভিড়-টিড়ের লোক। আমি বাপু গেঁয়ো-টেঁয়ো, ফাঁকা-টাঁকার মানুষ—মধুপুরের মেয়ে। আমার কই একটুও খারাপ লাগে না—পাগলও হচ্ছি না!'

গালের একটা পাশ শেষ ক'রে নবনী স্ত্রীর দিকে মুখ তুলে তাকাল। দেখল একটুক্ষণ। তারপর হেসে ফেলল। 'ভাল না লাগলেও এখন আর তোমার সে কথা বলার জো নেই।' নবনী আয়নার দিকে তাকিয়ে অন্য গালে ক্ষুর তুলল।

'কেন?'

'এ বাড়ি নিজেই তুমি পছন্দ করেছ!'

'করেছি তো! এখনও করছি! রেণু এ-পাশ ও-পাশ তাকিয়ে উঠন, বারান্দা, পাঁচিল, ঘরের দেওয়াল—সব যেন একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। হ্যাঁ, তার পছন্দ-করা মনোমতন বাড়ির ঝকঝকে সুন্দর চেহারাটা! সদ্য চুনকাম-করা বাড়িটার গন্ধও যেন তার নাকে এসে লাগল। পিঠের ওপর খুলে-যাওয়া খোঁপার কাঁটাগুলো খুলতে খুলতে উপর পানে তাকাল রেণু। খোঁপার পাক খুলতে বিনুনিটা পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়ল। হাতের মুঠোয় তেল-তেল কাঁটাগুলো নিয়ে রেণু একটু অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকল। মাথার উপর অশ্বত্থগাছের একটা পাতা-ভরা ঝাঁকড়া ডালের আগাটা তখন হাওয়ায় দুলছে, পাতাগুলো নড়ছে, রোদের খানিকটা সেই পাতায় পাতায়, খানিকটা রেণুর বুকের উপর শাড়ি ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়েছে। শুধু বাড়ি নয়, এই গাছ, পাঁচিল টপকে অশ্বত্থের একটি শাখা তার প্রশাখা-পল্লব নিয়ে উঠনের মাথার উপর ঢলে পড়েছে, ঢেকে ফেলেছে—এইটুকুও বড় ভাল লেগেছিল রেণুর। প্রথম দিন উঠনে পা দিতেই রেণুর চোখে এ বাড়ির এই আশ্চর্য সম্পদটুকুই আগে চোখে পড়েছিল। আর রেণু অবাক হয়ে গিয়েছিল, মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। তখন পড়ন্ত বিকেল। স্তিমিত, শান্ত, অনুত্তাপ, সোনা-গলার মত সুন্দর রোদ পাতার জাফরিতে উপচে পড়েছে। আশ্চর্য সেই রং, অপূর্ব সেই ছায়া-বোনা-বোনা পাতার চাঁদোয়া! শীর্ণ ডগাটা একটু-একটু নড়ছিল, পাখি

আসছিল উড়ে উড়ে—ডানার শব্দে, ডাকে ডাকে সমস্ত গাছটাই যেন হঠাৎ খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠল। রেণু এত তন্ময় হয়ে পড়েছিল যে, তার মনে হল, রেণুর পায়ের শব্দে গাছটা যেন কতকাল পরে কল্‌কল্‌ ক'রে কথা বলে উঠল। কাছে পেয়ে যেন খুশি দিয়ে আগলে ধরল।

বাড়িতে এসে উঠতে নয়, বাড়ি তখন দেখতে এসেছিল রেণু। এসেই মুগ্ধ হল।

ফেরার পথে নবনী শুধাল, 'কেমন দেখলে গো বাড়ি?'

'সুন্দর—খুব সুন্দর!' রেণু তখনও অভিভূত হয়ে ছিল।

রেণুর পছন্দ বড় খুঁটিনাটি মেনে চলে। নবনী একটু অবাক হয়ে বললে, 'বল কি! তোমার মতন লোকের এক নজরেই এত পছন্দ হয়ে গেল!'

আশেপাশে লোক ছিল না। ধুলোর রাস্তা দিয়ে ওরা হাঁটছিল। সন্ধ্যে হয়ে আসছে প্রায়—ফাঁকা মাঠ দিয়ে হাওয়া বয়ে আসছিল, মেঠো গন্ধ, পাকুড়গাছের ঝোপের ওপর একটা পাখি ডাকছিল। রেণু হঠাৎ বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, মশাই! হয়েছে, পছন্দই হয়েছে, খুব পছন্দ! যেমন তোমার হয়েছিল এক নজর দেখেই!' কথাটা বলে ফেলে রেণু হাসল। এবং নবনীর একটা হাত আঁকড়ে ধরে ঘন হয়ে গেল আরও। আর ভাবল, এই তুলনাটা তার হঠাৎ কি ক'রে মনে এল, মুখেও এসে গেল, কে জানে!

রিভারসাইডের এই রাস্তাটা বড় ফাঁকা, আর বাড়িটা একরকম লোকালয়ের বাইরে বলে নবনীর একটু আপত্তি ছিল। অসুবিধের কথাও তুলেছে নবনী। কলের জল নেই বাড়িটায়, কুয়া থেকে জল টানতে হবে—লণ্ঠন অবশ্য এখানেও জ্বালাতে হচ্ছে, সেখানেও জ্বালাতে হবে। ভাল ক'রে ভেবে দেখ।

রেণু ভাল ক'রে ভেবে দেখেছে। ফাঁকাই তো সে চায়! এই ফাঁকার জন্যে পুরনো বাজারের বাড়িতে সে ছটফট করছে। আর, লোকালয় নেই—এ কথা ব'লো না। সামান্য একটু দূরেই তো পার্সি সাহেবদের বাংলো, তার পাশেই হলদে মতন দোতলা একটা বাড়ি! দু-চার ঘর আরও আছে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে। ভয় নেই, তোমার বউকে কেউ চুরি ক'রে নিয়ে যাবে না দিনদুপুরে! এ ছাড়া আর আপত্তি কিসে! কলের জল নেই, না থাকুক; তোমাদের এই শহরের কষ্টা ময়লা জলের চেয়ে কুয়ার জল অনেক ভাল। আমাদের মধুপুরে আমরা কুয়ার জল খেয়েই মানুষ।

নবনী ইচ্ছে ক'রেই যে কথা এড়িয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত সেই কথাটা বললে। 'একদম নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে রেণু, ও বাড়িতে! কথা বলার মতন লোক পাবে না একটা। আমি কোন্ সকালে বেরিয়ে যাব, ফিরতে বিকেল শেষ। অতক্ষণ একা-একা তুমি থাকবে কি ক'রে, কাকে নিয়ে?'

কথাটা বুঝতে পারে রেণু। সহজেই ধরতে পারে। মুখটা হঠাৎ বিষণ্ণ, একটু বা কালো হয়ে আসে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে রেণু একটু-ক্ষণ। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলে, 'তা কি করব, কাউকে নিয়ে থাকার কপাল যখন হচ্ছে না!' একটু থেমে আবার, 'একা আমি বেশ থাকতে পারব—সে আমার ভাল লাগবে। বরং এই এখানে পাঁচ পড়শীর সব তাতে কান-পাতা, হাসি-তামাশা, মজলিসী আমার ভাল লাগে না, একেবারেই নয়।' রেণু বুক-ভরা নিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে গিয়েছিল। তারপর মুখ নিচু ক'রে আঁচল খুঁটতে খুঁটতে আনমনে একটা গিট বেঁধে ফেলল। 'তোমারও সুবিধে হবে, ও বাড়িতে গায়ে-গতরের এই কষ্টটা বাঁচবে। আমি সব ভেবে দেখেছি।'

নবনীর সুবিধে সত্যিই হবে। রিভারসাইড রোডের বাড়ি থেকে [illegible] মেঠো পথ দিয়ে গেলে রেললাইন টপকে তাদের স্টিল ওআর্কসে যেতে মিনিট দশেক লাগে। মাত্র মাইলটাক পথ। আর এখন পাঁচ মাইল রাস্তা সাইক্‌ল্ ঠেঙাতে হচ্ছে যেতে আবার আসতে। গ্রীষ্ম-বর্ষা নেই, নিত্য দশ মাইল সাইক্‌ল্ ঠেলা। নবনী তার কষ্টের কথা কদাচ বলেছে, কিন্তু রেণু নিয়ত তা অনুভব করেছে।

এর পর আর কোন কথা ছিল না। পুরনো বাজারের সেই এঁদো গলির ঘিন্‌জি আর নর্দমার গন্ধ-ঘিনঘিন বাতাস থেকে নবনী-রেণু—দুটি প্রাণীর ক্ষুদ্র সংসার রিভারসাইড রোডের এই ফাঁকা ছিমছাম ছোট্ট সুন্দর বাড়িতে উঠে এল। যে বাড়ির সামনে দিয়ে লালচে ধুলোর কাঁচা সড়ক এঁকেবেঁকে চলে গেছে দামোদরের দিকে, এ-পাশ ও-পাশ মাঠ, উঁচু-নিচু ক্ষেত, আলের গোলকধাঁধা, ধুলোয়-ঢাকা পলাশঝোপ, বনতুলসী, কাঁটা বেগুন। পাকুড়-বট-অশ্বত্থের কিছু মিশেল এখান-ওখান। বাড়ির সদরের কাছে ছোট কুয়া, সিমেণ্ট দিয়ে ধার-বাঁধানো, হুইল-ঝোলানো।

আর এ বাড়ির বাইরে সেই অশ্বত্থগাছ—যার একটা বিরাট শাখা প্রশাখা-পল্লবে পাতার জাফরি বুনে উঠনের আধখানা ঢেকে ফেলেছে। আলো, আর আকাশ, আর মেঘ এবং পাখি ও তারা সেই জাফরির বুননি আলগা ক'রে ক'রে রেণুকে হাতছানি দিচ্ছে সব সময়।

বড় জোর দিন পনর হল এসেছে রেণু এই নতুন বাড়িতে। কিন্তু পনর মাসের ভালবাসা পড়ে গেছে এর মধ্যেই। রেণু বেশ আছে, খুশী হয়েই আছে। নিঃসঙ্গতা বাস্তবিক [illegible] অনুভব [illegible] করে কিছু। [illegible] বর [illegible] রেণু [illegible] খানিক বেলায় এবং রোদ্দুরে, ঘুঘু-ডাকা অলস দুপুরে, ছায়া-নামো-নামো

বিকেলে নিজেকে যেন খুলে-মেলে, ছড়িয়ে টুকরো-টুকরো সুখ, সুখের স্বপ্ন দিয়ে ভরিয়ে সুন্দর ক'রে তার মন নিকিয়ে নেয়। তারপর নবনী ফিরে এলে অবসরের সেই শান্ত, আনমনা, স্বপ্নবিভোর রেণুকে রেখে দিয়ে অন্য এক রেণু যেন ঘুম ভেঙে আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। আবার কথা, ডাকাডাকি, হুট্‌হাট্‌, কাপ-প্লেটের ঠুন্‌ঠান্‌, বেলুন-চাকির খটখট, হাতা-খুন্তির শব্দ। মনে হয়, দুপুরের গাঢ় ঘুম থেকে আবার যেন বাড়িটাকে জাগিয়ে দিল রেণু। রেণু এবং নবনী।

ওরা এ বাড়িতে এসেছিল পুজোর পর-পরই। আশ্বিনের শেষ তখন। কুয়াতলার কাছে শিউলি-ঝাড়ে সন্ধ্যেয় আকুল-করা গন্ধ ফুটত তখনও। তারপর কার্তিক পড়ল। রোদ এবং আকাশ আরও কিছুদিন বেশ উজ্জ্বল আর নীল হয়ে ছিল। শরৎ যেন গিয়েও যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত গেল—হেমন্তের ভোরে একটু-একটু হিম পড়ছিল, ঘাসে শিশির ঝরছিল এবং রাত্রে আকাশের নিচে কুয়াশার খুব পাতলা একটা পরদা যেন ঝুলত। একদিন—হ্যাঁ, তেমনি এক হেমন্তের সন্ধ্যায় একদিন—নবনীর খানিকটা দেরি হয়ে গেল বাড়ি ফিরতে। সদরটা খোলাই ছিল—নবনী সাইকল্‌ নিয়ে উঠনে এসে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেল। সারাটা বাড়ি নিঝুম হয়ে আছে ; কোথাও এক ফোঁটা আলো জ্বলছে না। রেণুর কোনও সাড়াশব্দ নেই। নবনী চমকে উঠেছিল এবং আর একটু হলেই হয়তো চিৎকার ক'রে ডেকে বসত। কিন্তু রেণুর চেহারাটা চোখে পড়ে গিয়েছিল বলে নবনী বোকা বেরসিকের মতন আর চিৎকার ক'রে উঠল না। বরং দেখল, দেখতে লাগল, বারান্দার ধার ঘেঁসে বসে গালে হাত দিয়ে রেণু তন্ময় হয়ে যা দেখছিল। উঠনের ওপর এলিয়ে-পড়া অশ্বত্থের ডালপালায় নীলের রং মেশানো অপরূপ জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে।

যেন রুপোর জলে একরাশ ডুবনো পাতা ভাসছে। ভিজে-ভিজে, নরম এবং মসৃণ। সেই পাতার জাফরি গলিয়ে উঠনের সিমেণ্টে কেমন এক ছায়া-বোনা চাঁদের আলো লুটিয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, রেণুর গায়ে এবং পায়ে এই ছায়ার নক্‌শা-কাটা আলো সুন্দর হয়ে ছড়িয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল, কিসের এক সুন্দর চাদর যেন ঘন ক'রে জড়িয়ে রয়েছে রেণু। আর, সেই ঘন স্পর্শের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—ঘুমিয়ে রয়েছে।

নবনী আস্তে ক'রে রেণুর ঘোর ভাঙিয়ে দিল। চমকে উঠে রেণু চাইল।

'কি ব্যাপার ? বাতিটাতি জ্বাল নি আজ—এমন ক'রে বসে আছ ?'

কোনও জবাব দিল না রেণু সে কথায়। আস্তে আস্তে ঘরে এসে ঢুকল। বাতি জ্বেলেছিল রেণু ; বাতিগুলো সবই জ্বলছিল—মিটমিট ক'রে, পলতের আগায় এক-নখ পরিমাণ আলো নিয়ে। পলতে বাড়িয়ে দিতে দিতে রেণু যেন এতক্ষণ পরে নিজেকে ফিরে পেল।

'এত দেরি ?' নবনীর হাত থেকে ছাড়া জামা নিতে নিতে রেণু আলনার কাছে এগিয়ে গেল। দু-পাট করা ধুতিটা নিয়ে আবার কাছে এসে দাঁড়াল।

'আর বল কেন ! ফাল্‌তু ক'টা কাজ ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল—শেষ ক'রে তবে উঠলাম।' রেণুর হাত থেকে কাপড় নিয়ে নবনী একটু থেমে বললে আবার, 'যাই বল, বাড়িতে পা দিয়ে আজ আমার বুক চমকে উঠেছিল।' একটু হাসল ও, 'একেবারে ভোঁ-ভাঁ, অন্ধকার—তোমায় দেখতে পাচ্ছিলাম না ; ভাবলাম, সীতাহরণ বুঝি হয়ে গেছে।'

রেণুও ঠোঁটে হাসল। নবনীর দিকে চেয়ে বললে, 'কি করব ! তুমি ফিরছ না—বাইরে বসেছিলাম।'

'একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলে। কি দেখছিলে অত একমনে—

চাঁদের আলো, না গাছ ?'

কথাটার কোনও জবাব দিল না রেণু। ঘর ছেড়ে যেতে যেতে বললে, 'এস তাড়াতাড়ি—চায়ের জল হতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

চা খেতে খেতে নবনী বললে, 'একটা ঝি রাখবে সারাদিনের ?'

'ঝি ! কেন ?'

'তোমার কাজকর্ম ক'রে দেবে। তা ছাড়া, সারাদিন একটা মানুষ থাকবে বাড়িতে ! দুটো কথাও তো বলতে পারবে !' নবনী রেণুর দিকে চেয়ে থাকল।

রেণু মাথা নাড়ল। পায়ের ওপর কাপড়টা একটু উঠে গিয়েছিল, হাত দিয়ে টেনে দিতে দিতে বললে—মুখ নিচু ক'রেই, 'দুজনের একফোঁটা সংসারের জন্যে আবার ঝি কি হবে ? আমি তা হলে করব কি ?'

নবনী যে এ কথাটা না বোঝে, তা নয়। সবই বোঝে। সংসারের ছোটবড় দশটা কাজ নিয়েই রেণু আছে। তাদের দুটি প্রাণীর সংসার এত ছোট এবং কাজ সত্যি-সত্যি এত কম যে, একটা কাজ একবার সেরে রেণু সময় ফুরোতে পারে না। দরকার নেই, তবু একই কাজে বারেবারে ঘুরে-ফিরে হাত লাগাবে রেণু। কি মানে হয় ! তবু একফোঁটা এই ঘর দিনে দশবার ঝেড়ে-মুছে সাজাচ্ছে। বিছানা টেনে টেনে রোদে দিচ্ছে [illegible] ছুচে,

নবনী খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে, 'একটা রেডিও কিনবে—

ব্যাটারি সেট? বেশ সস্তায় পাওয়া যাবে!'

রেণু মুখ তুলে ভাল ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখল নবনীকে। 'কি ব্যাপার বল তো? মাইনে-টাইনে হঠাৎ বেড়ে গেছে নাকি তোমার?'

নবনী হাসল। 'আরে না, মাইনে আর কোথায় বাড়ল! বলছিলাম এমনি; রেডিও থাকলে বেশ সময় কাটত তোমার—গান-টান শুনতে!'

'আমার সময় কাটানো নিয়ে তুমি দেখছি খুব সমস্যায় পড়েছ!'

নবনী যদিও কিছু বললে না, মাথাও নাড়লে না, তবু তার মুখ দেখেই মনে হচ্ছিল, সত্যিই এটা তার কাছে সমস্যাই এবং যথেষ্টভাবে ব্যাপারটা নিয়ে। বিশেষ ক'রে এ বাড়িতে আসার পর আরও যেন বেশি ক'রে ভাবছে।

ক'দিন পর নবনী হঠাৎ এক মজার প্রস্তাব ক'রে বসল।

'আমি ভাবছি, তোমায় এবার থেকে একটা টাস্ক্ দিয়ে যাব।'

'নাকি! হোম্ টাস্ক্?' হাতের বইটা মুখের কাছ থেকে সরিয়ে স্বামীর দিকে চাইল রেণু। এবং হাসল।

'হ্যাঁ। কাজটা প্রথম-প্রথম ভাল না লাগলেও শেষে দেখবে, নেশা ধরে গেছে।'

নবনী হেসে হেসে বলছিল, 'তা ছাড়া, একবার যদি লাগাতে পার, আর দেখতে হবে না—ক্যাশ চল্লিশ কি পঞ্চাশ হাজার টাকা!'

'ক্রস্ওআর্ড বুঝি!' রেণু হাসছিল।

'হ্যাঁ। তুমি শুধু সুটেবল্ ওআর্ডগুলো বেছে রাখবে ডিক্শনারি ঘেঁটে—বাকিটা আমি করব।' নবনী উৎসাহিত হয়ে উঠল।

রেণু এবার খিলখিল ক'রে হেসে ফেলল। 'তার চেয়ে একটা দাবার ছক্ কিনে নিয়ে এস। যাবার আগে তোমার শেষ চাল দিয়ে যেও—আমি সারাদিন গজ-নৌকো সামলাতে মত্ত থাকব।' হাসি থামলে বললে,

'যদি বল—আমি বরং রোজ দুপুরে দশ পাতা ক'রে হাতের লেখা লিখতে পারি, গোটা কুড়ি ক'রে যোগ-বিয়োগ-লসাগু-গসাগু।' কথাটা শেষ ক'রে আবার হাসল রেণু।

নবনী চোখ কুঁচকে মিষ্টি ক'রে যেন ধমক দিল বউকে। 'হ্যাত, খালি ইয়ারকি! যা বলব, তাতেই হাসিতামাশা। আমার কি—কচু! আমায় তো আর সারাদিন, দুপুর ভূতের মতন একা-একা বাড়ি আগলে বসে থাকতে হয় না! কষ্ট তোমারই—তুমিই বোঝ!'

রেণু স্বামীর মুখের দিকে আরও খানিক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। বেশ একটু আন্‌মনা হয়ে পড়েছিল রেণু; বইএর পাতা যদিও একটুক্ষণ চোখের সামনে খুলে বসে থাকল, কিন্তু আর মন বসছিল না। বালিশের পাশে বই রেখে, হাঁটু মুড়ে, কুঁকড়ে, দেওয়াল-মুখো হয়ে শুয়ে পড়ল। লণ্ঠনের আলো দেওয়ালের যেখানটায় আসে নি, আসতে পারে নি—সেই অন্ধকারের দিকে আধবোজা চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল।

এখন রেণু ভাবছিল—সারাদিন আর দুপুর, আর বিকেলের ছায়া ঘন না হওয়া পর্যন্ত আমার সময় কি ক'রে কাটে, নবনী তাই ভেবে ভেবে আকুল হয়ে পড়েছে। ওর ধারণা—এই দীর্ঘ সময় আমি একা-একা ভূতের মতন কাটাই এ বাড়িতে, কথা বলতে না পেয়ে আমার বুক শুকিয়ে ওঠে, আমি হাঁসফাঁস করি।

কিন্তু আমার সময় কেমন ক'রে কাটে, নবনী যদি তা জানত, আর বুঝত! সে জানে না; তার বোঝার জিনিসও এ নয়।

তুমি বুঝবে না। রেণু চোখের পাতা পুরো বুজে ফেলল এবং স্বামীকে মনে মনে বলল, আমি মধুপুরের মেয়ে—এখানে কোন্ মধু নিয়ে কেমন ক'রে আছি, কত সুখে!

'কিন্তু, রেণু কি ক'রে সেই সকাল নটা সওয়া-নটা থেকে বিকেল

পাঁচটা পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় একা-একা কাটায়, এই রিভারসাইড রোডের ফাঁকা বাড়িতে! নবনী চলে যাবার পর আর কি থাকে—কোন্ আকর্ষণ?

থাকে। আকর্ষণ থাকে। এবং সুখও আছে।

নবনী চলে গেল। সদরে খোলা কপাটে হাত দিয়ে, কোনদিন বা কুয়ার সামনে দাঁড়িয়ে রেণু দেখল, সাইক্‌লে চেপে নবনী এঁকেবেঁকে দেখতে দেখতে দূরে চলে গেল; তারপর ধুলো-ভরা পলাশের ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গেই যে রেণু সদর বন্ধ ক'রে ঘরে ঢুকল, তা নয়। দাঁড়িয়ে থাকল সামনে চেয়ে। কিংবা একমনে শিউলিগাছের ঝোপটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। এখানে দুটো তিতির রোজ নেমে আসে। চড়ুইদের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে ঘাসে, ছাইএর গাদায় কি যেন খুঁটে খুঁটে খায়; ঝটপট্ করে; উড়ে যায়। আবার ডেকে ডেকে রেণুর পায়ের কাছে টুপ ক'রে নেমে আসে। বাড়ির মধ্যে হুট্ ক'রে ঢুকে পড়ে রেণু। উঠনে নামানো নবনীর এঁটো থালার ভাতটাতগুলো এনে ছাই-গাদার কাছে ছড়িয়ে দেয়। আর, দেখতে দেখতে কাক-চড়ুই-শালিক ঝাঁক বেঁধে নেমে আসে।

খানিকটা সময় এইভাবে কাটল। তারপর সদর ভেজিয়ে উঠনে এসে দাঁড়াল রেণু। এতক্ষণে মাথার ওপর অশ্বত্থের ডালপাতার পাশ কাটিয়ে প্রথম-শীতের সুন্দর রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে আধখানা উঠন জুড়ে। মুখ তুলে তাকায় রেণু। আগায় একটি-দুটি কচি পাতা নিয়ে অশ্বত্থের একটি সরু ডাল পত্‌পত্‌ ক'রে মাথা নাড়ছে। যেন কত খুশী! আর, এক পাশে পাতায়-পাতায় আলুথালু, ক্ষ্যা মতন, রোগা একটা ডাল দোল খাচ্ছে। উড়ে-আসা কাকের পায়ের চাপে, গায়ের ভারে। কোথাও

থা একটুও কাঁপন নেই ; পাতাগুলো সব আঁকা ছবির মত নিথর হয়ে আছে।

এরই মধ্যে টুপ্‌টাপ্‌ ক'টা পাতা উঠনে এসে পড়ল ; আঙুলের মত শুকনো ছোট ডাল ফেলে উড়ে গেল কাক। আড়াল থেকে দুষ্টু কোনও পায়রা হয়তো মল ফেলে গেল। আরও কত কি—কুটোকাটা, মাছের কাঁটা, সাপের খোলস !

গাছটার দিকে তাকিয়ে রেণু একটু চোখ কোঁচকাল। মনে মনে বললে, দাঁড়াও, এখনই আমি ঝাঁটা হাতে করছি না ! আগে একটু চা খাই, চুল খুলি—তারপর।

তারপর সময় হলে কোমরে আঁচল জড়িয়ে, পিঠে চুল এলিয়ে রেণু উঠনটা একবার ঝাঁট দিয়ে নিল। ঢাকা বারান্দাটুকুও। নারকেল-ঝাঁটা দিয়ে উঠন ঝাঁট দেয় না রেণু—দিতে পারে না। ফুলঝাঁটার নরম গা দিয়ে সুন্দর ক'রে পাতা, ডাল, কাঁটা, খড়কুটো—সব টেনে নিয়ে উঠনের এক পাশে করে।

এবার রোদে মোড়া টেনে নিয়ে বসল খানিক। কি কি করবে, করতে হবে—ভাবল গাছের দিকে চোখ তুলে। হয়তো প্রথমেই নরুন দিয়ে বসে বসে নখগুলো কাটল হাতের। তারপর পায়ের। গায়ের ব্লাউসটা খুলে ফেলল। রোদের তাতে তাতে গরম লাগছে। চিরুনি দিয়ে চুলের জট ছাড়াল বসে বসেই।

ঘরে ঢুকল এবার রেণু। ঘরদোর পরিষ্কার ক'রে ঝেড়ে-মুছে বেরুতে খানিকটা সময় লাগে। আবার উঠনে এসে নামল যখন, হাতে হয়তো বালিশের ওয়াড় কিংবা তোয়ালে, নবনীর গেঞ্জি-রুমাল—এমনি কত কি ! উঠনের এক পাশে নামিয়ে রাখল সব। জল আনল কুয়া থেকে। কাচতে বসল। গাছের পাতা কেমন ক'রে যেন ঠিক তার মাথার ওপর ছায়া

এনে ফেলেছে—ততক্ষণে।

কাচাকুচি শুকোতে দিয়ে আবার একবার উঠন ঝাঁট দিল রেণু। এরই মধ্যে আবার ক'টা পাতা, খড়কুটো ছিটিয়ে পড়েছে। জল দিয়ে উঠনটা ধুয়ে ফেলল। তারপর ওর স্নান। স্নানের আগে জল তোলা, এঁটোকাঁটা বাসনগুলো মেজে নেওয়া, রান্নাঘর ধোয়া।

তারপর স্নান। সদর বন্ধ। পাঁচিলের আড়াল এক পাশে, অন্য পাশে রান্নাঘরের গা লাগিয়ে টানা উঁচু দেওয়াল। মাথার ওপর অশ্বত্থপাতার জাফরি। রেণুর ভাল লাগে এই উঠনে নেমে রোদে অনেকখানি সময় নিয়ে স্নান করতে। একটু-একটু ক'রে সাবান ঘসতে, অযথাই জল কুলকুচো ক'রে ফেলতে, এবং হঠাৎ চুপ ক'রে হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে পায়ের কাছে সাবানের ফেনা জমা দেখতে। আঙুল দিয়ে সেই ফেনা কাটে রেণু অন্যমনস্ক হয়ে, বিভোর হয়ে। হঠাৎ একটা কাক হয়তো ডেকে ওঠে, একটি অশ্বত্থের পাতা উড়ে উড়ে এসে ওর খোলা কাঁধের ওপর টুপ ক'রে পড়েই বুক গড়িয়ে কোলের ওপর থেমে যায়। কখনও বা পিঠের পাশে পড়ে—পিঁড়ির ধারে-কাছে। এই পাতা রেণু সহজে ফেলে না, ফেলতে পারে না। তার সাবান-গন্ধ সুন্দর লম্বাগড়ন হাতে আলতো ক'রে তুলে নিয়ে কেমন ক'রে যেন দেখে।

স্নান শেষ হলে রান্নাঘরেই খেতে বসে রেণু। খেতে খেতে গাছটার দিকে তাকায়। তাকায়, আর আনমনা হয়ে যায়।

তারপর শীতের দুপুরে রেণু বারান্দায় মাদুর পেতে ফেলে। লেপটা, [illegible]। [illegible] এক [illegible]শে পানের লালে ঠোঁট রাঙিয়ে [illegible] কটা [illegible] দেয় কি দেয় না, হুসহাস ক'রে [illegible]খ তা[illegible], গাছের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে ধমক দেয়, উঁহু, আর নয়—বিছানা নোংরা হবে।

এর পর সারাটা দুপুর সেই নিঝুম, বিভোর, ঘুম-ঘুম, খড়-রং রোদে, এলোমেলো হাওয়ায় রেণু বসে বসে গাছের দিকে চোখ তুলে তুলে উল-কাঁটা নিয়ে নবনীর সোয়েটার বোনে। তখন এই গাছ—গাছের পাতাই তার সব। তাদের সঙ্গে যত মনের চুপ-চুপ অস্ফুট কথা, তাদের জন্যে একটু বা ঘাড় কাত ক'রে হাসি, মাঝে মাঝে মিষ্টি মিহি গলায় গানের গুনগুন।

দেখতে দেখতে দুপুর কেটে যায়। অশ্বত্থের পাতা থেকে রোদ সরে যায়। একটু পরেই ছায়া জড়িয়ে আসতে থাকে ডালে-পাতায়। পাখিরা ফিরে আসে। গাছটা যেন ঝটপট্ ক'রে ওঠে, শব্দে ভরে যায়, হাওয়া বয়ে যায়—ঠাণ্ডা হাওয়া; একটা মেঘ এসে খানিক দাঁড়ায় গাছের মাথায়—আকাশে, তারপর আস্তে আস্তে কখন সরে যায়। নবনীর সাইক্লের ঘণ্টি বেজে ওঠে বাড়ির কাছে।

সারাদিন, আর দুপুর, আর এই প্রথম-বিকেলের আশ্চর্য এক স্বপ্ন, তন্দ্রাবিভোর নিস্তব্ধতা থেকে রিভারসাইড রোডের বাড়ি চমকে জেগে ওঠে।

রেণু আবার নবনীর—নবনীকান্ত রায়ের—সুন্দরী স্ত্রী হয়ে ওঠে। সুপটু ঘরনী।

হ্যাঁ, এই আশ্চর্য সুখ এবং এই গাছ-গাছ, নরম কেমন এক অদ্ভুত মন নিয়ে মধুপুরের মেয়ে রেণু এমন ফাঁকা নির্জন বাড়িতে দিব্যি ছিল। বেশ শান্তিতেই। তারপর পাতা-ঝরার দিন এল।

শীত তখন যেন একটু কমেছে—একদিন কোথা থেকে এক দমকা হাওয়া এল; আর সাত-সকালে রেণু যখন রাতের বাসি কাপড় ছেড়ে উঠন দিয়ে আসছে রান্নাঘরে, একমুঠো রোদ তার গায়—তখন, ঠিক তখনই—কতকগুলো পাতা এসে ঝরে পড়ল। রেণুর গায়ে, পায়ে, উঠনে। রেণু

থমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাল। অশ্বত্থের ডালপালা কাঁপছে, হলুদ-হলুদ রোদ-পোড়া ক'টা পাতা দুলছে।

ঝরা পাতা ক'টা উঠনের এক পাশে সরিয়ে দিতে গিয়ে রেণু দেখল, তার কতক শুকনো, কতকের আধখানা গা হলদে, কাঠ-রং খড়খড়ে হয়ে গেছে।

সেই শুরু। এর পর প্রথম কয়েক দিন মাঝে মাঝে পাতা ঝরেছে। দেখতে দেখতে কি যে হয়ে গেল, রেণু ভাল ক'রে বুঝতেও হয়তো পারল না, পাতা-ঝরার খেলা শুরু হল।

হ্যাঁ, খেলা। খেলা বইকি! থেকে থেকে হাওয়া দিচ্ছে—দমকা হাওয়া, অশ্বত্থের ঝাঁকড়া ডালের পাতাগুলো গা হেলিয়ে মাথা দুলিয়ে পট্‌পট্‌ কেমন এক শব্দ করছে, তারপর ঝরঝর ক'রে ঝরে পড়ছে সারা উঠন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। রোদ একটু তেতে উঠলেই যেন খেলাটা জমে ওঠে। নবনী তখন অফিস বেরিয়ে গেছে। এই একরাশ পাতা ডাঁই করল রেণু ঝাঁট দিয়ে, তারপর হয়তো লণ্ঠনের চিমনিগুলো পরিষ্কার করছে কিংবা টেবলটা গুছচ্ছে ঘরে গিয়ে—শুনতে পেল, টুপ্‌টাপ ক'রে পাতা ঝরছে, মেঝেতে খস্‌খস্‌ ক'রে ঘসটে যাচ্ছে। রেণুর কানে এই মৃদু শব্দও আজকাল ধরা পড়ে যায়। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে রেণু, ঠিক্ তাই—আবার উঠন ভরে শুকনো, হলুদ, আধ-হলুদ পাতা ঝরে পড়েছে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রেণু কোমরে আঁচল জড়িয়ে আবার পাতা কুড়োতে বসে। পাতাই শুধু নয়—ছোট ছোট ডালপালা, খড়-কুটোও। ডাঁই ক'রে একটা জায়গায় রাখে সব। আন্দাজে বোঝে, এক-আঁচল পাতা আবার ঝরেছে।

খেলাটা নতুন। কিন্তু রেণুর এই খেলাই সবচেয়ে ভাল লেগে গেল—সারা দুপুর ভরে এই ঝরা-পাতা কুড়োনোর খেলা। সব অবসর

যেন তারা কেড়ে নিল। ঘুরতে-ফিরতে, বাসন ধুতে, জল তুলতে, স্নান করতে রেণু বারবার উঠনের মধ্যে থমকে দাঁড়ায়; আর অশ্বত্থগাছটার এই শয়তানি দেখে। হ্যাঁ, শয়তানি বইকি! রেণু ভেবে দেখেছে এবং একা-একা বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছে, গাছটাকে শুনিয়ে শুনিয়ে, দাঁড়াও—দেখছি! তোমার এই ঘর নোংরা করার ফন্দিফিকির আমি এবার বন্ধ করব!

বাস্তবিক, গাছটা যেন রেণুর কাজ বাড়াবার জন্যে দুষ্টুমি ক'রে একটা ফন্দি এঁটেছে।

শুধু তোমায় নিয়ে থাকলেই আমার সব হবে না! রেণু একদিন সত্যি-সত্যি সেই ফাঁকায় চোখ পাকিয়ে গাছটাকে ধমকে উঠেছিল: খালি নোংরামি!

আর একদিন যখন রান্নাঘরে খেতে বসেছে, আর একটা ময়লা পাতা উড়ে এসে পাতে পড়ল। রেণু একটুক্ষণ অবাক চোখে গাছটার দিকে তাকিয়ে আধবোজা গলায় বলে ফেলল, শান্তি ক'রে দুটো ভাত খেতেও দিবি না!

মুখে যাই বলুক, রেণু কিন্তু এই যেন ভালবাসত। সারাটা দিন, দুপুর, বিকেল এই যে একটা দেখ-দেখ ভাব, ঝালাপালা হওয়া, ঝঞ্ঝাট পোহানো—এর কি যেন এক গাঢ় সুখে ও ভরে গিয়েছিল।

একদিন আচমকা বলল নবনীকে, কথায় কথায়, 'কচি ছেলে থাকারও অধম হয়ে উঠেছে বাড়িটা! কি যে জ্বালা জ্বালায় বাপু ওই অশ্বত্থগাছটা, কি বলব! আর পারি না!'

নবনী হেসে জবাব দিল, 'তোমারই তো গাছ! একটু জল।'

কথাটা রেণুর কেমন যেন লেগেছিল কানে। অদ্ভুত-অদ্ভুত। মনে মনে কয়েকবারই নবনীর গলা দিয়ে কথাটা আবৃত্তি করেছে। আর কি আশ্চর্য,

রেণু হঠাৎ ভেবেছে, এ গাছটা যদিও তার নয়, তবু তার যদি নিজের রক্ত-মাংস থেকে একটা সেই গাছ হত—এমনি ক'রেই জ্বালাত!

পাতা-ঝরার খেলাও ফুরল। সব পাতা ঝরে ঝরে সেই অশ্বত্থ একদিন শূন্য হয়ে গেল। তার শাখাপ্রশাখা নিষ্পত্র হয়ে আকাশ, আর রোদ, আর মেঘকে মুক্ত ক'রে দিলে। রেণু সেদিন অশ্বত্থের এই রিক্ততা করুণ চোখ নিয়ে দেখেছে। তার বুক টন্‌টন করছিল, জল আসছিল চোখে। উদাস হয়ে কতক্ষণ যে তাকিয়ে থেকেছে! তারপর হঠাৎ উত্তরের কোণ ঘেঁসে লিকলিকে সরু একটা ডালে দুটি কচি পাতার মাথা তুলনো দেখে নিশ্বাস ফেলেছে। এবার নতুন পাতার পালা! রেণু প্রথমটায় একটু খুশী হলেও যখন ভেবে দেখল, তার অফুরন্ত অবসরে আর কেউ ভাগ বসাতে আসবে না এখন, অনেক—অনেক দিন, তখন আবার বুক ঠেলে ভারি একটা নিশ্বাস উঠে এল। সেদিনটা কিছু আর ভাল লাগে নি রেণুর।

পরের দিন আরও ক'টি নতুন পাতা দেখল গাছে। রেণু বেশিক্ষণ সেদিকে চাইল না। পরের দিন আরও কিছু নতুন পাতা। রেণু এবার চাইল। তারপর এই নতুন পাতার খুশিকে আর সে না মেনে নিয়ে পারল না। মনে মনে যেন সব বোঝাপড়া ক'রে নিয়ে হেসে বললে, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই—এসেছ, বেশ হয়েছে! নিজের মতন থাক—আমায় জ্বালিও না!

নতুন পাতায় দেখতে দেখতে যখন গাছ ভরেছে, তখন একদিন এক দুপুরে রেণুর মনে কেমন এক খটকা লাগল।

ক'দিন যেতে রেণু আর এক দুপুরে মনে মনে হিসেব করলে। একই হিসেব—সোজা; কিন্তু সারাটা দুপুর সেই হিসেবে কাটল।

আরও ক'টা দিন গেল। রেণু কেমন যেন বিশ্বাস করতে পারছিল

না। তার ভয় হচ্ছিল; রাত্রে ঘুমুতে পারছিল না। স্বপ্ন দেখছিল হিজিবিজি।

তারপর একদিন অশ্বত্থের সেই ঝাঁকড়া-মাথা ডাল যখন নতুন পাতায় পাতায় ছেয়ে গেছে, বাড়িটা ভরে অদ্ভুত এক বুনো গন্ধ—রেণু বুঝতে পারল, যার আশা ছেড়েই দিয়েছিল ওরা, বিয়ের তিনটি বছর পরে সেই আশা যেন দানা বেঁধে উঠেছে। এখন মনে হচ্ছে, নবনী-রেণুর মধ্যেও একটি নতুন পাতা এইবার ফুটছে।

শেষ পর্যন্ত আর কিছু অবিশ্বাসের থাকল না। কোনও সন্দেহ রেণুর মনে 'কি জানি' হয়ে খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল না। রেণু বুঝল, স্পষ্ট ক'রেই বুঝতে পারল, তার রক্তমাংস এবার এক নতুন প্রাণ গড়ছে।

নবনী বললে, 'চল ডাক্তারের কাছে। প্রথম থেকেই কেয়ার নেওয়া ভাল।'

রেণু একটুও আপত্তি করলে না।

আর কিছুদিন পর নবনী প্রস্তাব করলে, 'একটা ঠিকে ঝি পাওয়া গেছে, সকালে-বিকেলে কাজ ক'রে দিয়ে যাবে। আসতে বলে দি, কেমন? বেশি-খাটাখুটি এ সময়ে তোমার উচিত নয়।'

আশ্চর্য, রেণু এবারও আপত্তি করলে না।

ঝি এল। সকালেই আসত—রোদ উঠে গেলে। কাজকর্ম সেরে চলে যেত। আবার আসত দুপুর গড়িয়ে গেলে। ঝট্‌পট কাজ চুকিয়ে চলে যেত। কতটুকু সময়ই বা থাকত; কিন্তু রেণুর কত কাজ যেন কেড়ে নিল! অবসর আরও দীর্ঘ হল। অঢেল, অফুরন্ত সময় হাতে নিয়ে রেণু কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন, শান্ত, স্থির হয়ে গেল।

তারপর বৈশাখের প্রখর তাপ এবং সেই নদীর চর থেকে ঝাঁপিয়ে-আসা ঝড় থেমে গেল। আকাশ কালো হচ্ছিল, মাঝে মাঝে চাতক

ডাকছিল, মাটি-ভেজা গন্ধ আসছিল ভেসে ভেসে। বৃষ্টিও নামল। এই ফাঁকা বাড়ির নীরবতাকে আরও নিবিড় ক'রে কত দিন, সারা রাত ভরে শ্রাবণের জল ঝরে গেল। অশ্বত্থের পাতায় কত সব বিচিত্র শব্দ তুলে। এবং শেষে আবার নীল আকাশ জেগে উঠল, রোদ ঝক্‌মক ক'রে উঠল।

রেণু তার একান্ত একাকিত্ব, নবনীশূন্য সময় কি ক'রে কাটিয়েছে? চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে! ভেবে ভেবে, সাতপাঁচ কল্পনায় এবং স্বপ্নে বিভোর থেকে কি!

হ্যাঁ, তাই! রেণু যখন একা, নিঃসঙ্গ, কোন কাজ নেই, আর আলস্যে তার গা-হাত সব—সমস্ত যখন একটুও নড়তে চাইত না, তখন রেণু বারান্দার ছায়ায় কি কাছাকাছি কোথাও বসে পাখির ডাক শুনতে শুনতে এলোমেলো মনে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই ঝাঁকড়া-ডাল অশ্বত্থকেই দেখেছে, তাদের পাতার শব্দ শুনেছে, আর পাতার জাফরিতে মধ্যাহ্নের আলো-ঝিলমিল ছায়া দেখেছে। বর্ষার দিনে এই গাছের ফাঁক দিয়ে মেঘ, এদের পাতায় হাওয়ার পত্‌পত্‌, বৃষ্টির শব্দ। আবার যখন শরৎ ফুটল, আকাশের নীল থেকে সুন্দর রোদ ঝরে পড়তে লাগল, রেণু তখনও এই গাছের পাতা আর ডালপালা দেখে দেখে তার দুপুর কাটাল। এবং শুধু সকালের গড়িয়ে-আসা রোদ-ভরা দুপুর নয়, রেণুর তিল-তিল ক'রে গড়ে-তোলা স্বপ্নের সুন্দর দুপুর, তার প্রতিটি মুহূর্ত।

এই দুপুরও গড়িয়ে গেল। রেণুকে একটু আগেভাগেই হাসপাতালে রেখে এল নবনী।

এক বিকেলে ফিরল রেণু। হেমন্তের কুয়াশা তখন এখানে এই ফাঁকায় গাঢ় হয়ে নামছে। হাসিখুশী মুখ। তবু একটু যেন ফ্যাকাশে,

চুলগুলো রুক্ষ-রুক্ষ। কিন্তু বড় সুন্দর লাগছিল রেণুকে। আর, রেণুর বুকের মধ্যে, হাতের নিবিড় বন্ধনী থেকে একটি শিশুর দুর্বল কান্না উঠে এখানের হাওয়ায় মিশছিল। মাথার ওপর অশ্বত্থের ডালপালা হঠাৎ কেমন এক উদ্ভট হাওয়ায় ঝটপট ক'রে নড়ে উঠল। পাখিরা ডাকল, ডানা ঝাপ্‌টে ঝাপ্‌টে স্তব্ধতা ভেঙে দিল, শিশুর কান্না ডুবে গেল। রেণু একটিবার ওপর পানে চেয়ে তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসে উঠল।

রিভারসাইড রোডের বাড়িতে কথা এবং কাজের খুটখাট্ শব্দের ফাঁকে ফাঁকে এখন এক দুর্বল কান্না শোনা যায়। ককিয়ে ককিয়ে একটি শিশু কাঁদে। রেণু হাতের কাজ ফেলে ধড়মড় ক'রে ছুটে যায়।

সব সময়ে অত কাঁদলে কি চলে, খোকন! রেণু ছেলেকে আদর করে, দুধ দিতে দিতে গালে-মুখে কতকগুলো চুমু খেয়ে বেশ জোরে জোরে বলে, এবার তুমি বারান্দায় শোবে। রোদে। তোমায় অলিভ অয়েল মাখাব। চুপটি ক'রে শুয়ে থাকবে। তেল-গায়ে রোদ খেলে কেমন সুন্দর শরীর হবে তোমার—নধর-নধর, ননী-ননী!

বারান্দার চেয়ে উঠনটায় রোদ আসে আগে। উঠনে শোয়াতে পারলেই ভাল হত—একটু বেশিক্ষণ রোদ পেত। কিন্তু রেণু খুবই বিরক্ত হয়; উঠনে শোয়ানোর জো আছে নাকি! কোথা থেকে একটা কাঠির মত ডাল হয়তো ছেলেটার কচি গায়ে এসে পড়বে, নাকের ওপর পাতা উড়ে এসে আঁচড় কেটে যাবে, পাখিতে হেগে দিয়ে যাবে। যত রাজ্যের ময়লা সব! একদিন ছেলেকে শুইয়ে দেখেছে রেণু। দশটা মিনিটও বেচারীকে রাখা যায় নি! ভীষণ বিরক্ত হয়েছিল রেণু। তারপর থেকেই বারান্দাতেই শোয়ায়। তাতেও রক্ষে নেই। কখন যে কি উড়ে আসে—পাখি-টাখি, পাতা-টাতা! ছেলেকে শুইযে রেণু

নিজে বসে বসে আগলায়। আর ভীষণ বিরক্ত হয় এই গাছটার ওপর। ওর জন্যেই যত পাখি-টাখি, নোংরা-টোংরা।

কিন্তু তবু একদিন একটা হাড় এনে ফেললে কাকে—খোকনের গায়ের পাশেই। আর একদিন একটা বিঘত-খানেকের মরা সাপ এক্কেবারে খোকনের গায়ের ওপর। রেণু আঁতকে উঠল। হাউমাউ ক'রে ডুকরে উঠল।

'শুনছ, এ বাড়িতে থাকা চলবে না!' রেণু সেই দিনই নবনীকে বললে, 'কোনদিন একটা অঘটন ঘটে যাবে!'

নবনী কানেই তুলল না কথাটা।

ক'দিন বাদেই আবার এক কাণ্ড। হাত-পরিমাণ একটা ডাল ভেঙে পড়ল একেবারে রেণুর মাথায়। রেণু ছেলেটাকে কোলে ক'রে উঠন বেয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছিল। কপালে লেগেছিল তার। তা লাগুক—কিন্তু রেণু থপ্ ক'রে রান্নাঘরে ঢুকে ভয়ে নীল হয়ে গিয়ে ভাবল, ডালটা যদি তার মাথায় না পড়ে খোকনের মাথায় পড়ত! তুলতুলে মাথা, রক্তের ডেলা—এক্ষুনি রক্তারক্তি হত! কিছুতেই বাঁচত না ছেলেটা!

গাছটার দিকে বিষাক্ত ঘৃণার চোখে চেয়ে রেণু দাঁত চেপে খানিকটা দাঁড়িয়ে থাকল।

নবনীকে এবার সোজাসুজি বললে রেণু, 'এ বাড়িতে আর একটা হপ্তাও নয়! আজই শেস হয়ে গিয়েছিল ছেলেটা! বাব্বা, কি সর্বনেশে গাছ!'

'একটু সাবধানে থাকলেই পার।' নবনী জবাব দিলে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে।

'আবার কি সাবধান হবে! এর চেয়ে কত সাবধান হতে মানুষে পারে!' রেণু রেগে উঠল, 'সারাটা দিন ছেলেটাকে ঘরের মধ্যে

ঠাণ্ডায় অন্ধকারে পুরে রাখব নাকি! ওর আলো-হাওয়ার দরকার নেই? কি রকম শীতটা পড়েছে, দেখছ না!'

'তা, বেশ তো! রোদই খাওয়াও ছেলেকে—একটা আড়াল-টাড়াল দিয়ে নিয়ো!' নবনীর সহজ জবাব।

'আড়ালে কি হবে? আড়ালটা মানছে কে?' রেণু উত্তেজিত হয়ে পড়ে, 'ওই গাছের কুটো-পাতা, নোংরা, পাখির গু-মুত্—কত রকমের নোংরা, জার্ম্‌স্—। ওই তো কচি ছেলে—ওর কি ইমিউনিটি আছে নাকি কিছু! ঝপ্ ক'রে একটা রোগ হবে, সামলাতে পারবে না!'

নবনী স্ত্রীর আশংকার বাড়াবাড়ি দেখে না হেসে পারে না। বলে, 'তুমি যে সেই রূপকথার ছোটরানীর মতন শুরু করলে। ছেলে পেটে আসতে-না-আসতেই ভয়ে জড়সড়। রাজপ্রাসাদের পদ্মপুকুর ভরাট ক'রে দাও, ছেলে যদি বেড়াতে গিয়ে ডুবে যায়; সব কাঁটা গাছ তুলে ফেল, যদি পায়ে কাঁটা ফুটে যায় তার।' একটু থামে নবনী। হাসির দমকটা থামিয়ে আবার বলে, 'ওসব বাজে ভয় ক'রো না তো! তা ছাড়া, ওই গাছটাই না তোমার খুব আদরের ছিল!'

'ছাই ছিল!' রেণু কোল থেকে ছেলেকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলে, 'যেদিন থেকে ছেলে কোলে এসেছে, ওটা যেন আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে! ওই শত্রু একদিন আমার সব নেবে! আমি বলছি! তখন দেখব, তোমার কত হাসি থাকে!'

নবনী আর কিছু বললে না। রেণু সত্যিই ভীষণ চটে গেছে! স্ত্রীর আশংকা-কালো মুখের দিকে চেয়ে নবনী হয়তো অবাক হয়ে কিছু ভাবছিল।

অশ্বত্থগাছটা সত্যিই শত্রুতা করছে রেণুর সঙ্গে। আবার তার পাতা-ঝরার দিন এল। আর, উঠন-বারান্দা থইথই ক'রে তার পাতা ঝরতে

লাগল দফায় দফায়। খোকনের জন্যে একটু জায়গাও সে দেবে না এই উঠন কিংবা বারান্দায়; এই রোদ, এবং আলো, ও হাওয়ার কোনও কিছুই। রেণুকে পর্যন্ত না। বারবার ব্যতিব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, ভীত ক'রে রাখবে।

রেণু কেমন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত ভয়। তার মনে শান্তি ছিল না, স্বস্তি ছিল না। শেষ পর্যন্ত বলতে হবে, ভগবান খুবই সদয়—তাই একদিন আচমকা পার্সি সাহেবদের সেই বাংলোর পাশের দু-পাঁচখানা ছিটনো-ছড়ানো বাড়ির একটা থেকে আরতি আর আরতির ননদ এ বাড়িতে বেড়াতে এসে হাজির।

দুজনেই অবাক—রেণু এবং আরতি। রেণু কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল, মধুপুরের আর এক মেয়ে আরতি এখানে হাজির রয়েছে! আরতিও ভাবতে পারে নি। দেখাসাক্ষাৎ হতে আহ্লাদে-খুশিতে দুজন গলে গেল। তারপর বাড়ির কথা উঠল। আরতি বলছিল, 'তোর বাড়িটা খুব সুন্দর রে! ফাঁকা—কত জায়গা! দুখানা বড় ঘর, ঢাকা বারান্দা, উঠন, ভাঁড়ারও আছে। সুন্দর গাছও। আমাদেরটা বড্ড ছোট! আর, গাছপালার একবিন্দু ছায়া নেই ধারে-কাছে। গরমে যা কষ্ট হবে!'

'নিবি এই বাড়িটা?' রেণু আচমকা শুধাল।

'ঠাট্টা করছিস?' আরতি হাসছিল।

'না, না—ঠাট্টা নয়! সত্যি বলছি! এ বাড়ি আমরা ছেড়ে দেব।' রেণু গম্ভীর হয়ে বললে।

'কোথায় যাবি?'

'যদি তোরা নিস এ বাড়ি, তোদেরটায় যাব। করবি পাল্টাপাল্টি?'

আরতি তবু বিশ্বাস করতে পারছিল না। এমন সুন্দর বাড়ি, কত জায়গা, গাছের ছায়া—

'তা, এ বাড়ি ছাড়ছিস কেন ?' আরতি শুধাল।

রেণু টপ্ ক'রে জবাব দিতে পারল না। একটু ভাবল। বললে, 'ওর অসুবিধে হয়। ভাড়াটাও একটু বেশি ভাই আমাদের পক্ষে। চল্লিশ টাকা। দিতে বেশ কষ্টই হয়!'

আরতি রাজি হয়ে গেল। তার আপত্তির কোনও কারণ থাকতে পারে না।

নবনী কথাটা শুনে বোকার মতন শুধু বললে, 'সত্যিই তুমি বাড়ি পাল্‌টাপাল্‌টিতে রাজি হয়ে গেলে ?'

রেণু কথা না বলে মাথা নাড়ল। আর খানিক পরে চাপা গলায় যেন নিজেকে শুনিয়েই বলল, 'আমার ছেলে আগে। তার কথা, ভালমন্দ ভেবে তারপর অন্য সব।'

পরের হপ্তাতেই বাড়ি-বদল শেষ হল। নতুন বাড়িতে গিয়ে রেণু শান্তি পেল। তার উদ্বিগ্নতা ধুয়ে গেল। হাসি ফুটল মুখে। এখানে অশ্বত্থ নেই, পাতা-ঝরা নেই; খড়কুটো, ময়লা সাপের খোলসে উঠন নোংরা নেই। রেণু নিশ্চিন্ত। ছেলেকে প্রাণভরে অলিভ অয়েল মাখাচ্ছে রেণু, রোদ আর হাওয়া খাওয়াচ্ছে—আর সারাদিন, আর দুপুর, আর বিকেল সেই এককোঁটা অবোধ শিশুকে নিয়ে, তার কাজ নিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে।

হ্যাঁ, মাসখানেক বড় জোর—তারপর এক সকালে নবনী যখন দাড়ি কামাচ্ছে, রেণুর কোলে ছেলেটা ঘুমোচ্ছে, আর রান্না করতে করতে গুন্‌গুন্ ক'রে ছড়া গাইছে ও, ছেলেটা হঠাৎ চোখ চেয়ে কেঁদে উঠে ক'বার হিক্কা তুলল, চোখের পাতা বুজল। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হল একটু, তারপর থামল। ওর শব্দ থামল গলার, নিশ্বাস থেমে গেল, একটু যেন কেমন নীলচে হয়ে গেল মুখটা।

বিশ্বাস করতে খানিকটা সময় লাগল রেণুর। কিন্তু বিশ্বাস না ক'রে উপায় ছিল না। কেননা, সেদিন আর দুপুর-বিকেল-রাত একটি দুর্বল অসহায় গলার কান্না এ বাড়িতে আর একবারও শোনা গেল না।

কোনও সাড়াশব্দ না দিয়ে, কোন কারণ না দেখিয়ে ছেলেটা যে কি ক'রে চলে গেল, হঠাৎ—রেণু তারপর থেকে শুধু তাই ভেবেছে, ভাবছে।

এ বাড়ি আরও চুপ হয়ে গেল। নবনীও যেন কথা বলতে, হাসি-তামাশা করতে ভুলে গেল। আরও যেন সকাল-সকাল সে অফিস চলে যায়, ফিরতে আরও দেরি করে। রেণু একা। ঝিটা আসে ; কাজকর্ম সেরে দিয়ে চলে যায়। রেণু কথা বলে না—যেখানে বসে, বসেই থাকে ; শুয়ে থাকল তো থাকলই ; কোথাও থমকে দাঁড়াল তো পাথর হয়ে গেল যেন।

এক-একটা দিন যে কি দীর্ঘ এবং দুঃসহ, আর কি ভীষণ কষ্ট এই সময়ের ঢিলেঢালা চলনে, রেণু আস্তে আস্তে তা বুঝতে পারছিল। তার সময় ফুরোয় না ; তার বুকের ওপর চাপ-হয়ে-থাকা ভারটা একটুও সরে না। বরং নবনী চলে গেলে, একা হয়েছে কি, রেণুর বুকের হাড়গুলোয় যেন কেউ নরুন দিয়ে কুরতে থাকে, বুকটা অসহ্য ব্যথায় টনটন্ করে, রেণু নিশ্বাস বন্ধ ক'রে বসে থাকে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। সারা দুপুর—সারা দুপুর। আর, থেকে থেকে ফুঁপিয়ে ওঠে। যদিও সে ফোঁপানোয় গলা-ভিজে-যাওয়া কান্না নেই, শুধু দলা-পাকানো পাক-খাওয়া বাতাসের থরথর ঝাঁকুনি আছে।

কেন এমন হল—এই কথা ভাবতে ভাবতে রেণু সব সময়েই সেই ডালপালা-ছড়ানো ঝাঁকড়া-মাথা থম্থমে অশ্বত্থগাছটাকে চোখের সামনে না এনে পারে না। চোখ বুজলেই গাছটা শকুনির পাখার মতন বিশ্রী এক ভয় নিয়ে যেন ওর মনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রেণু বুঝতে পারে, ওই—

ওই হিংসুক নিষ্ঠুর গাছটা খোকনকে সহ্য করতে পারে নি। তার বিষ-নিশ্বাস হাওয়া এখানে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারপর যেন রেণুকে ঠিকমতন জব্দ করতে, উচিত শিক্ষা দিতে ছোঁ মেরে খোকনকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছে ভরা কোল থেকে। কি হিংস্র আর হৃদয়হীন ওই তরু, কি নিষ্ঠুর!

রেণু যতক্ষণ ভাবে, ভাবতে পারে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেইসব ঘটনা মনে করে, যেসব ঘটনায় ওই অশ্বত্থের আড়াআড়ি ভাবটা ফুটে উঠেছে—হ্যাঁ, খোকনের সঙ্গে আড়াআড়ির, রেষারেষির। বলতে কি, খোকনকে নিয়ে সে বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই ওই গাছ শত্রুতা করতে শুরু করেছিল। খোকনের সঙ্গেই। গাছটা যেন হিংসে আর বিদ্বেষে জ্বলত। জ্বলছিল। ওই বোবা কিন্তু ভয়ংকর জীবনটা—রেণুর মনে হত—সব সময়ে চাইছে, রেণু আগের মতন তাকে নিয়ে মত্ত থাকুক। হ্যাঁ, রেণু তা বুঝতে পারত। তার হুঙ্কারের ভাষা তো রেণুর না-জানা নয়—তার মট্‌মট্‌ আছাড়িপিছাড়ি, গোঁ-গোঁ গর্জন! এই অন্যায্য, অন্যায় আব্দার রেণু কি ক'রে সহ্য করতে পারে! তুমি কে, কি আমার! শুকনো কর্কশ গা, আর বাউণ্ডুলে পাতার ঝুপড়ি নিয়ে বসে আছ! আমার জীবনের সঙ্গে, রক্তের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কিসের! আমার মাটি ধুলোকাদার নয়, আমার শিরা তোমার রুক্ষ কুৎসিত শিকড় নয় এবং আমার রক্ত তোমার গায়ের আঠা-আঠা জল নয়!

রেণুর এই সরাসরি উপেক্ষা-অবহেলা গাছটার যেন সহ্য হচ্ছিল না। সে দিন-দিন ভয়ংকর হয়ে উঠছিল, রেণু তা বুঝতে পারছিল; আর হ্যাঁ, ভয়—ভীষণ ভয় এবং ভাবনায় পড়ে গিয়েছিল। খোকনকে ওই রাক্ষুসে গাছটা কিছুতেই সহ্য করবে না—রেণু এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিল।

ও বাড়ি তাই ছেড়ে এল। কিন্তু সে ছাড়লেও ওই রাক্ষসটা ছাড়ল না। শোধ নিল। প্রতিশোধই বলা যায়।

মনে মনে গাছটাকে কুটিকুটি ক'রেও রেণুর আক্রোশ মেটে না। আবেগ চাপতে গলার শিরা নীল হয়ে গেলেও এইসব আবেগ রেণু রোধ করতে পারে না। তার সাধ্যে কুলোয় না।

এমনি ক'রেই কাটছিল দিন। অবয়বেই যেন বেঁচে আছে রেণু; তার মন মরে গেছে, তার জীবন থেমে গেছে। কোন বোধ নেই—অন্তত সুখের বা সান্ত্বনার।

হ্যাঁ, তারপর সেদিন আবার এক দুপুরে যখন আকাশ মেঘলা, মাঠ-ঘাট খাঁখাঁ করছিল, বেশ একটা তাপ ফুটছিল—রেণু যেন কখন সদর খুলে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে এই থম্‌থমে রিক্ততা দেখছিল চারপাশের। কতক্ষণ যে, রেণু জানে না। হঠাৎ তার মনে হল, কোথা থেকে যেন একটু অন্য-রকম হাওয়া এল। পরক্ষণেই এক ঘূর্ণি উড়ে এল, একটা পাক-খাওয়া বাতাসের ঢেউ। ধুলো উড়ছিল। আর, হঠাৎ সেই ধুলোর সঙ্গে মিশে একটা শুকনো অশ্বত্থপাতা এসে পড়ল রেণুর বুকে, একেবারে বুকের মাঝটিতে—শাড়ির ভাঁজে আটকে গিয়ে থেমে থাকল। রেণু হাত দিয়ে ফেলতে গিয়ে চমকে উঠল। অশ্বত্থের পাতা, শুকনো পাতা। সারা গা ঘিনঘিন ক'রে উঠল রেণুর। নোংরা পাতাটা ঝেড়ে ফেলে দিতে গিয়েও হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল তার। পাতাটা মুঠোয় ধরে দাঁড়িয়ে থাকল।

এখান থেকে আগের বাড়ির সেই অশ্বত্থগাছটা দেখা যায়—খুবই অস্পষ্টভাবে। একখণ্ড মেঘের মতন। কিন্তু আশ্চর্য, রেণু আজ এখানে দাঁড়িয়ে অত দূরের অমন অস্পষ্ট অশ্বত্থকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

সব যেন তাকে টানছিল—এই মেঘলা দুপুর, এই ঘূর্ণি, এই খাঁখাঁ মাঠঘাট এবং ওই দূর অশ্বত্থের শাখা-প্রশাখা-পল্লব। তাকিয়ে থাকতে থাকতে রেণু সব ভুলে গেল। শুধু গাছ—শুধু ওই অশ্বত্থই হাওয়ায়-হাওয়ায় অদ্ভুত এক চুপ শিস্-শিস্ শব্দে তাকে ডাকছিল। রেণুর চেতনা

ছিল না; রেণুর পা, রেণুর মন, চোখ—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কেউ যেন যাদু ক'রে অসাড় ক'রে দিয়েছে।

অদ্ভুত এক ঘোরে, নিশিতে-পাওয়া মানুষের মতন ঘুমের আচ্ছন্নতায় রেণু পা-পা ক'রে টলে টলে হেঁটে চলল। তারপর একসময়ে সেই অশ্বত্থের সামনে। গাছটার তলায়। মাটিতে, পাথরে, ঢিবিতে, শিকড়ে একটা অদ্ভুত অন্ধকার স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে এখানে। মাথার ওপর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা স্তব্ধ, শত সহস্র পল্লব নিস্তব্ধ।

রেণুর চোখে অন্য এক অপরিচিত জগৎ অস্পষ্টভাবে কেউ মেলে দিচ্ছিল। অশ্বত্থের সেই ভারি কালো গুঁড়ির ফাটা, ঠুকরোনো কঠিন দেহ কেমন এক যাদুতে খুলে গিয়ে খুব নরম এক হৃদ্‌পিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছিল। আর মৃত্তিকার অন্ধকার থেকে এক ঘ্রাণ উঠছিল। অতি নিস্তব্ধ, নির্বাক, সংগোপন এক প্রাণ যেন গুমরে উঠছে। গুমরে গুমরে।

রেণু জানে না, তার খেয়ালই নেই, কখন সে ধীরে ধীরে তরুতলে বসে পড়েছে, হাত দিয়ে গা ছুঁয়েছে—সেই তরুর, ঝুরি ধরে থেকেছে মুঠো ক'রে। তারপর কখন অচেতনে বুক উপুড় ক'রে আঁকড়ে ধরেছে সেই বিশাল তরুর একটু।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে কার যেন ঠেলায় চমকে উঠল রেণু। চমকে উঠল, উঠে বসল, চাইল। চিনতে পারল না। ঘোর কাটছিল না চোখের।

যখন ঘোর কাটল, তখন রেণু উঠে দাঁড়াল। চিনতে পারল। সামনে অবাক, ভীত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরতি। আর সে অশ্বত্থের তলায়।

রেণুর দিকে তাকিয়ে এবার আরতি ভীষণ অবাক গলায় বললে, 'কি রে, তুই হঠাৎ এখানে—গাছতলায় উপুড় হয়ে পড়ে? কি হয়েছে তোর?' আরতির চোখ হঠাৎ রেণুর বুকে আটকে গেল। আরও অবাক হয়ে

বললে আরতি, 'ইস্, সারা বুকখানা ভিজে গেছে যে! এত ঘেমেছিস?'

ঘাম? রেণু চমকে উঠে বুকের দিকে চাইল। ভিজেই গেছে—সারাটা বুক, ব্লাউস। তবে ঘামে নয়। তাড়াতাড়ি গায়ের আঁচলটা বুকে টেনে নিয়ে রেণু কিছু না বলে সোজা বাড়ির পথে ফিরে চলল।

আরতি ডাকছিল। রেণু শুনছিল না। হন্‌হন্ ক'রে হেঁটে যাচ্ছিল। আর মনে হচ্ছিল, এতদিন বুকের যে টন্‌টন্ ব্যথা তার অসহ্য—অসহ্য ছিল, আজ এখন সে ব্যথা যেন অনেক কমেছে।

সত্যি, অনেক কমেছে!

দুধ খাইয়ে, আর এক অবোধ শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে রেণু খুব নিশ্চিন্ত মনে এবার ফিরেই যাচ্ছিল। তার সংসারের কাজেই যেন।

অ্যাল্‌বাম

মল্লিকা তখনও দাঁড়িয়ে। ঠিক তেমনিভাবেই ; আধখোলা আলমারির কাঁচের পাল্লার গায়। আলগা শাড়ির অল্প একটু মেঝে ছুঁয়েছে, খানিকটা লুটোচ্ছে পায়। আয়নায় ঝক্‌ঝক্ করছে আর এক মল্লিকা।

মাঝে মাঝে এমনিই হয়। চলতে, ফিরতে, কথা বলতে হঠাৎ নিশ্বাস ফুরিয়ে নিথর হয়ে যায় মল্লিকা। তখন ও মানুষ নয়, যেন ছবি। ঠোঁট নড়ে না, চোখের পাতা পড়ে না ; একটুও কাঁপুনি থাকে না কোথাও—না হাতে, না পায়ে ; বুকের ওঠানামাটুকুও আশ্চর্যভাবে মৃদু হয়ে আসে। বোঝা যায় না, ফুসফুসে বাতাস আছে কি নেই।

আজও মল্লিকা ছবি হয়ে গিয়েছিল—বাইরে যখন ঝলসানো রোদ, ঘরে ফুলতোলা মোটা কাঁচের সার্সি আর পরদা রোদ শুষে শুষে ছায়া এনেছে, তখন। আর তখন ঘড়ির কাঁটা দশের ঘর ধরো-ধরো করছে। মাথার ওপর মোলায়েম গতিতে বাতাস কেটে চলছে পাখাটা। দালান কি পাঁচিল থেকে কখনও কখনও কাক কি চড়ুই ডেকে উঠছে।

অন্য সময় হলে ছবিটা দেখত পুষ্প আরও অনেকক্ষণ। কিন্তু এখন আর সময় ছিল না।

রুমাল, কলম, মনিব্যাগ পকেটে ভরতে ভরতে পুষ্প বললে, 'কি, পেলে না ?'

একটু চমকে গেল মল্লিকা। তন্ময়তা ভাঙল। নড়ে উঠল সামান্য। ঘাড় ঘোরাল। তাকাল স্বামীর দিকে। কথা বললে না, ডাগর দুটি

চোখ তুলে ধরল—তুলে রাখল।

স্ত্রীর চোখে চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে বললে পুষ্প, 'ওই একটাই তো ছবি আমাদের বিয়ের সময়কার—ওটা হারিয়ে ফেললে!' গলায় ক্ষোভ ফুটে উঠেছিল পুষ্পর। একটু থেমে আবার, 'তোমার তো অ্যালবাম আছে! তার মধ্যে—'

'অ্যালবামে রাখি নি।' পুষ্পকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মল্লিকা বললে এতক্ষণে। যদিও প্রশ্ন করলে না, তবু পুষ্প অবাক হচ্ছিল এবং বেদনাও অনুভব করছিল এই ভেবে যে, ওদের বিয়ের ছবিটা কি ক'রে অ্যালবামে না রেখে পারল মল্লিকা।

স্বামীর ম্লান বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন হয়তো বোধ করলে মল্লিকা। বললে, 'ছবিটা কেউ দেখতে নিয়েছিল বোধ হয়, আর ফেরত দেয় নি।' মল্লিকার গলার স্বর মিহি এবং শান্ত। এত শান্ত যে, একটা নিস্পৃহতা ফুটে উঠছিল। প্রসঙ্গটা যেন এখানেই শেষ করতে চায় ও।

অথচ প্রসঙ্গটা ঠিক এখানে শেষ করার নয়। পুষ্প ভাবছিল, কি করা যায়! জব্বলপুর থেকে বড়দি বারবার চিঠি লিখছে। বিয়েতে আসতে পারে নি, বউ দেখে নি—বিয়ের সময় জোড়ে তোলা ফটোটা পাঠিয়ে দিতে।

অনুশোচনার একটা শব্দ জিভে টেনে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে পুষ্প, 'তা হলে এখন?'

'কি আর!' মল্লিকা স্বামীর ছেলেমানুষিতে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে উঠেছে যেন, 'কলকাতা শহরের পথে-ঘাটে স্টুডিও। একটা ছবি তুলে তোমার দিদিকে পাঠিয়ে দিলেই হল!'

এর পর আর কি কথা থাকতে পারে! পুষ্পও কথা খুঁজে পেল না।

স্ত্রীর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল। দশটার ঘর ছুঁয়ে ফেলেছে কাঁটা দুটো। দেরি হয়ে গেল অফিসের। অযথাই একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে কি বললে যেন পুষ্প। সম্ভবত বিদায় নিল।

ঘরে একলা হয়েও একা হতে পারল না মল্লিকা। আলমারির আয়না-দেওয়া পাল্লাটায় আর এক মল্লিকা ছিল। এবং সেই ঝক্‌ঝকে মল্লিকার চোখে চোখ উঠিয়ে এ মল্লিকা আবার যেন ছবি হয়ে ফুটে ওঠার চেষ্টা করলে। হাল্‌কা বাসন্তী-রং শাড়িটা আগের মতই কোথাও আঁটোসাটো, কোথাও আল্‌গা হয়ে গা, পা, হাতের একটু-আধটু অংশে ভাঁজ ফেলছিল। পিঠের ওপর ভিজে কালো চুল ছড়ানো। মিষ্টি একটা গন্ধ মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে। হাতের চুড়ি-আংটি ঝিকমিক করছে। সরু, সাদা ধবধবে গলায় মিহি-গড়ন হার, বুকের ওপর মিনে-তোলা লকেট। আর ঈষৎ দীর্ঘ ধরনের মুখ—আয়নায় ভেসে রয়েছে। মাঝ-সিঁথিতে সরু ক'রে সিঁদুর ছোঁয়ানো, কপালে ক'টি কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ নেমেছে। স্পষ্ট উঁচু নাক; পাতলা ঠোঁট—ধনুক-গড়ন। টানা-টানা চোখ নয়—তবু ডাগর, টলমলে, আর শান্ত। এই চোখের সঙ্গে মল্লিকার ধারালো চিবুক ঠিক মিল খায় না। অথচ চোখ সয়ে গেছে বলে এখন আর খুঁতটুকুও ধরা পড়ার নয়।

সবই তেমনি ছিল—তবু মল্লিকা আর আগের মতন ছবি হয়ে ফুটে উঠতে পারছিল না। হাত, পা, মুখ, ঘাড় না নড়ালেও ওর চোখের মধ্যে একটা চঞ্চলতা ছটফট করছে। পাতা পড়ছে বারবার, দৃষ্টিটাও স্থির হয়ে নেই। আর বুকটা থেকে থেকে চাপা নিশ্বাসের ভারে দ্রুত কেঁপে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গটা তখন স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থামিয়ে দিতে চাইলেও থেমে

যায় নি ; মল্লিকার মনে এখনও ঘোরাফেরা করছে। সত্যিই তো, ফটোটা গেল কোথায় ? মল্লিকা মনে করবার চেষ্টাও করছিল মাঝে মাঝে। অ্যালবামে রাখে নি। রাখার কথাও ভাবে নি কখনও ; যদিও ফটোটা বিয়ের সময়কার এবং একটি বিশেষ সময়, স্মরণীয় মুহূর্ত ধরা থেকে গেছে সেই ছবিতে—তবুও না। মল্লিকার নিজের গোটা চারেক ছবি কিন্তু আছে বিয়ের সময়কার। হ্যাঁ, অ্যালবামেই—চকলেট রঙের পুরু খসখসে কাগজের ওপর। বধূ মল্লিকার টুকরো-টুকরো চারটি রূপ—বিচ্ছিন্ন চারটি মুহূর্ত। একটি ছবি তুলেছিল সেজদা, গায়ে-হলুদের পর। এখনও যেন সেই ছবিতে একটি গুন্‌গুন্ মিষ্টি দুপুরের কথা লেখা আছে—হলুদের দাগ। আর একটা তুলেছিল প্রভাত, ওর খুড়তুতো ভাই—যখন লাল টুকটুকে বিয়ের চেলি পরে, কপালে-গালে চন্দনের ফোঁটা এঁকে কেমন যেন এক নেশায় থমথমে হয়ে ও বসেছিল। তখনও সিঁথিতে সিঁদুরের রঙ ধরে নি। জোরালো আলোয় তোলা ছবি বলেই নয়, সেই গাঢ় সন্ধ্যায় মল্লিকা রক্ত-গোলাপের মতই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ছিল—তাই অত সুন্দর হয়েছে ছবিটা। অন্য দুটি ফটোর একটি বিয়ের পরদিন স্নানশেষের পর। তখন মাঝ-সিঁথির সিঁদুর, আর অলংকার, আর চওড়া-পাড় শান্তিপুরী শাড়িতে চেহারাটাই কেমন যেন নতুন হয়ে গেছে। ছবিটা তুলেছিলেন জামাইবাবু। আর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আসল জিনিসটা তো আর কপালে জুটল না, ভাই—দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাব ! শেষ ছবিটা অবশ্য শ্বশুর-বাড়িতে ফুলশয্যার দিন তোলা। এটাও তুলেছিল প্রভাত। সাজে-সজ্জায় ঝলমল করছিল মল্লিকা তখন। চমৎকার দেখাচ্ছে ছবিতেও মল্লিকাকে।

অ্যালবামে ফটোগুলো আঁটা হয়ে যাবার পর পুষ্পও দেখেছিল। খুশী হয়েছিল খুব। আর, ছবি দেখতে দেখতে বলেছিল, 'বা, সুন্দর হয়েছে ! তা, তোমার-আমার একসঙ্গে তোলানো ছবিটাও এর সঙ্গে এঁটে

রেখে দিয়ো।'

ঘাড় নেড়েছে মল্লিকা, হ্যাঁ, এঁটে রেখে দেব। কিন্তু দেয় নি। কথাটা মনে পড়েছে কখনও কখনও। তবু এঁটে রাখে নি ছবিটা। হয়ে ওঠে নি।

আজ, এখন, মল্লিকা ভাববার চেষ্টা করছিল, ছবিটা সত্যি কোথায় গেল! কেউ দেখতে নিয়েছে, পরে দিতে ভুলে গেছে! পুষ্পকে এরকম একটা কৈফিয়ত অবশ্য দিয়েছে মল্লিকা। কিন্তু যত দূর মনে পড়ছে, কেউ নেয় নি দেখতে। এবং তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও মল্লিকা সে ছবি তার ঘরে কোথাও পেল না। পায় নি। আশ্চর্য!

সকালের ক্ষোভটুকু ধুয়ে দিল মল্লিকা সন্ধ্যেবেলায়। পুষ্পকে বললে, 'তৈরি হয়ে নাও—বেরুব।'

'কোথায়?'

'কেন, ভুলে গেলে? ফটো তুলতে যাব, বলেছিলুম না!'

'ও, হ্যাঁ। তা আজকেই?'

'কি এমন হাতি-ঘোড়া কাজ যে, আজ নয় কাল নয় ক'রে ফেলে রাখতে হবে! যাব স্টুডিওতে একটা—দশ-বিশ পাও হাঁটতে হবে কি হবে না!' মল্লিকা স্বামীর চায়ের কাপ, প্লেট মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিতে নিতে বলল।

'বেশ তো, চল! একটু বেড়িয়ে আসাও যাবে!' পুষ্প সিগারেট ধরাল।

মল্লিকা চলে গেল। ভালই লাগছিল পুষ্পর। অফিস থেকে ফিরে স্নান করেছে। চাটাও খাওয়া শেষ হল। ফাঁকা উঠনে বেতের চেয়ারে বসে রয়েছে। জলকালি অন্ধকার। ঝিরঝির হাওয়া বইছে থেকে থেকে। মাথা তুললেই তারা-ঝিকমিক আকাশ।

কোথাও যদি কোনও ক্ষোভ পুষে রেখে থাকে পুষ্প, এর পর—মল্লিকার কথার পর—সব ধুয়ে যাওয়া উচিত। বলতে কি, তা গিয়েছে। আসলে, স্ত্রীর ওপর যদি বা একটু অভিমান ক'রেই থাকে পুষ্প সকালে অফিস যাবার সময়, পরে আস্তে আস্তে তা মিলিয়ে গেছে কখন। মল্লিকা এমন স্ত্রী—যার কাজকর্মে আচার-আচরণে ত্রুটি ধরবে, তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি করবে বা দুঃখ পাবে, পুষ্প তেমন স্বামী নয়। অত্যন্ত সহজ-ভাবেই দুটো কথা স্বীকার ক'রে নিয়েছে পুষ্প মনে মনে। মল্লিকা সুন্দরী এবং মল্লিকা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। তার রূপ, তার বিয়ের পাঁচরকম যৌতুক নিয়ে মল্লিকা অনায়াসেই অন্য কারও স্ত্রী হয়ে যেতে পারত। তা যে যায় নি, সেটা নেহাতই ভাগ্য। পুষ্পর ভাগ্য।

হ্যাঁ, পুষ্প তাই মনে করত—মনে করে এখনও। অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের মতন মল্লিকা তার কাছে এসে গেছে। আশাতীত পুরস্কার পেয়েও মন খুঁতখুঁত করবে, এমন অবুঝ পুষ্প নয়। বরং এখানে তুলনায় তার অযোগ্যতার কথাটাই প্রথমে মনে পড়ে। সে লজ্জা তাকে ঘিরে রয়েছে। হীনমন্যতার সংকোচও। কাজেই, ছোটখাটো ত্রুটি যদি ঘটে, কোনও কারণে খুঁত লাগেও মনে, তবু সামান্য সেসব বিষয় ভুলে যাবার চেষ্টা করে পুষ্প। ভুলে যায়ও।

তা ছাড়া ভালবাসা আছে। কেমন এক নিবিড় অনুরাগ। মোহ এবং আকর্ষণও। মল্লিকাকে এতখানি ভালবাসার পর তুচ্ছ খুঁটিনাটি, কোনও গরমিল বা একটু-আধটু দুঃখ কি অভিমান মনের মধ্যে ফেনাতে বসবে, তাই কি সম্ভব পুষ্পর পক্ষে! না, সেসব অনায়াসেই সয়ে যেতে পারে পুষ্প—হাসিমুখেই ক্ষমা করতে পারে।

ছবি হারানোর ক্ষোভও কখন ভুলে গিয়েছিল পুষ্প। মল্লিকা নিজের থেকে না বললে ফটো তুলিয়ে আসার কথাই ওর মনে পড়ত না এখন

দু-চারদিন, যতদিন না আবার জব্বলপুর থেকে বড়দির তাগাদা আসে চিঠিতে।

পথে বেরিয়ে মনে পড়েছিল। কর্নওআলিস স্ট্রীটের ক'টা দোকানই ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল পুষ্প। মল্লিকা যেতে যেতে থমকে দাঁড়াচ্ছিল ফটো তোলার দোকানগুলোর সামনে।

পুষ্প বললে, 'এখানে নয়। আমার এক বন্ধুর স্টুডিও আছে বিবেকানন্দ রোডে। পুরনো বন্ধু। তার দোকানেই চল। ছবিটাও ভাল ক'রে তুলে দেবে। তা ছাড়া দেখাও হবে, অনেককাল দেখাসাক্ষাৎ নেই।'

প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল পুষ্প। কবে দেখেছে এক-দরজার ক্ষুদে একটা দোকান—এখন দেখে, মস্ত ঘর জুড়ে স্টুডিও। দরজার পাশে পেতলের টবে পাতা গাছ, প্রকাণ্ড শো-কেস, আট-দশখানা ফটো—সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো। ফ্লোরোসেণ্ট বাতি জ্বলছে।

ভেতরে পা দিতেই দেখা হয়ে গেল সরোজের সঙ্গে। কাকে যেন কি বোঝাচ্ছিল। সোফায়, চেয়ারে দু-চারজন খদ্দের বসে। পুষ্পরা ঢুকতে সরোজ তাকাল। মুখে ধপ্ ক'রে একটা খুশির হাসি ফুটে উঠলেও মল্লিকার দিকে তাকিয়ে কথা আসছিল না ঠোঁটে।

পুষ্পই কথা বললে প্রথমে। হাসলে। খুব একটা বড় চমক দিয়েছে যেন, তেমন ধরন কৃতিত্বের হাসি।

'কি রে, চিনতে পারিস ?'

'পারি না আবার!' সরোজ পুষ্পের কাছে ক' পা এগিয়ে আসতে আসতে বলল। এবং কাছে এসে দাঁড়াল, 'তুই হঠাৎ ?' সরোজ বন্ধুর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে মল্লিকার দিকে তাকাল।

'এলাম। তোরা তো আর খোঁজ-খবর নিস না!' পুষ্প হাসছিল, 'আলাপ করিয়ে দি। আমার স্ত্রী—মল্লিকা। আর ও, বলেছি আগেই, পুরনো বন্ধু—সরোজ।'

সরোজ নমস্কার করলে হেসে। সরু-সরু আঙুল, ধবধবে নরম দুটি হাত জোড় ক'রে কপালের কাছ পর্যন্ত আনলে মল্লিকা। ঠোঁটের পাশ বয়ে মিষ্টি একটা হাসি ছড়িয়ে গেল।

'কি ভাগ্য আমার!' সরোজ অপ্রতিভ হাসি হেসে বলছিল, 'আমার বন্ধুটির শেষ পর্যন্ত মনে পড়েছে আমাকে! নয়তো আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবার সুযোগই ঘটত না! আসুন, ওই পার্টিশনটার পাশে একটা পায়রা-খোপ আছে আমার—ওখানেই বসা যাবে!'

সরোজ সেই ধরনের মানুষ, সহজেই যারা ঘনিষ্ঠ হয়ে যেতে পারে। পাঁচরকম কথা বলে, হেসে, অন্যকে হাসিয়ে প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতাটুকু কাটিয়ে দিতে পারে চট্ ক'রে।

দশ মিনিটের মধ্যে এমন কাণ্ড ক'রে বসল সরোজ যে, মনে হল, মল্লিকার সঙ্গে ওর কম ক'রেও দশটি মাসের চেনা-জানা। আর, অনায়াসেই মল্লিকার সসংকোচ গাম্ভীর্যটুকু খসিয়ে দিলে। মল্লিকা জানতেই পারল না, কখন পুষ্প-সরোজ দুই বন্ধুর অন্তরঙ্গ আলাপ-হাসি-ঠাট্টার মধ্যে ও নিজেও মিশে গেছে।

কাজের কথাটা পাড়ল পুষ্প শেষ পর্যন্ত।

'একটা ছবি তোকে তুলে দিতে হবে যে!'

'কার? তোর, না ওঁর?' সরোজ মল্লিকার দিকে চেয়ে মুচকি হাসে।

'দুজনেরই আমাদের, একসঙ্গে।' পুষ্পও হাসল।

'জলজ্যান্ত দুটো মানুষ থাকছিস একসঙ্গে, তাতে হচ্ছে না—আবার

ফটো?' সরোজ আড়চোখে-চোখে দেখল দুটিকে।

'সব সময় কি আর থাকছি একসঙ্গে! আমি যখন বাজার, অফিস কি আড্ডা মারতে, তখন তো ও একা! আবার ও যখন বাপের বাড়ি যায়, তখন আমি অ্যালোন্!' পুষ্প হাসল। ওরাও। হাসি থামলে বললে পুষ্প, 'দিদিকে পাঠাতে হবে। মনে আছে তোর দিদিকে?'

'মনে থাকবে না আবার! কোথায় এখন দিদি?'

'জব্বলপুর।'

একটুখানি চুপ। সরোজ বললে শেষে, 'নে, তবে ওঠ্—পাশের ঘরে চল্।'

বেশ যত্ন ক'রেই ফটোটা তুললে সরোজ। দুজনকে পাশাপাশি রেখে। তারপর মল্লিকার একা একটা। নিজের থেকেই আগ্রহ জানিয়ে। আর বললে মল্লিকাকে—ফটো তোলা শেষ হলে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে, 'বা! ক্যামেরার সামনে একটুও জড়সড় হন না আপনি, দেখছি! ভাল হবে ছবি।'

আরও সামান্যক্ষণ কথাবার্তা হল। যাবার সময় পকেটে হাত ঢুকোতে ঢুকোতে বললে পুষ্প, 'তা হলে পরশু সন্ধ্যেবেলা আমি আসছি ফটো নিতে! তা, কত লাগবে তোর?' মনিব্যাগটা বের ক'রে ফেলেছে পুষ্প ততক্ষণে।

'কি? টাকা?' সরোজের মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল নিমেষের জন্যে। পরক্ষণেই হাসি টেনে জবাব দিল, 'মাথা খারাপ নাকি তোর! এর জন্যে আবার টাকা কিসের?'

'না, না—সে কি! এটা তোর ব্যবসা—' পুষ্প কিন্তু-কিন্তু করছিল।

'ঠিক আছে! ধর না, এটা তোদের বিয়েতে আমার গিফ্ট!' সরোজ সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল পুষ্পকে। মল্লিকার দিকে তাকিয়ে

হেসে বললে, 'জানেন তো, ও আমায় বিয়েতে নেমন্তন্ন পর্যন্ত করে নি!'

'জানি।' মল্লিকা মাথা নেড়ে হাসল একটু, 'আগেও বলেছেন!'

'বলেছি নাকি! তা বলে থাকতে পারি! হয়তো আরও শ'খানেক-বার বলব! চূড়ান্ত অভদ্রতা করেছে পুষ্প কিন্তু!' সরোজ সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

'আমি কিন্তু আপনাকে আমাদের বাড়িতে আসতে নেমন্তন্ন করছি!' মল্লিকা রুমাল দিয়ে কপাল মুছল, 'কবে আসছেন?'

'যাব।'

'তবে তুইই পরশু আয় না, সরোজ!' পুষ্প উঠতে উঠতে বললে।

'হ্যাঁ, তাই ভাল। পরশুই আপনি আসুন। নিশ্চয়ই! রান্নাবান্না ক'রে রাখব—যদি নষ্ট হয়, তবে—' মল্লিকাও হাসিঠোঁটে অন্তরঙ্গ সুরে বললে। ভ্রূভঙ্গি করলে একটু।

ফটো দুটো পকেটে ক'রেই গেল সরোজ ঠিক দিনটিতে। সন্ধ্যে-বেলা। দুটো ছবিই চমৎকার উঠেছিল। গুণী লোক সরোজ। চমৎকার না হয়ে উপায় কি! তবু নিজের হাতের গুণের কথা একবারও বললে না। বারবার মল্লিকার প্রশংসা করলে। ফাইন ফটোফেস্; ক্যামেরা-কন্‌সাস্ নয় এক বিন্দুও! মনে হয় না, ছবি তোলাচ্ছে মল্লিকা—মুখের সামনে ক্যামেরা হাতে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। আশ্চর্য স্বাভাবিক, সহজ এলোমেলো ভঙ্গি! যেন মনে হয়, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, কিংবা একটা পাখি কি ফুল দেখছে। অথবা আনমনা হয়ে ভাবছে যেন কিছু—কোন কথা।

যাও বা একটু দ্বিধা ছিল, প্রশংসা শুনতে শুনতে তাও কেটে গেল। নিজের অ্যালবামের খাতা দুটো বের ক'রে দিল মল্লিকা। বললে, 'দেখুন

বসে বসে।'

দেখল সরোজ। এবং পাশে বসে বসে পুষ্পও। একটি-একটি ক'রে পাতা উল্‌টে যাচ্ছিল সরোজ। ভালমন্দ মন্তব্য করছিল। তবে যার ফটো, তাকে নয়—যে তুলেছে, তাকে। আর আশ্চর্য হচ্ছিল সরোজ, অদ্ভুত লাগছিল তার—দুটো অ্যালবাম-খাতার প্রায় সব ক'টি পাতা জুড়ে শুধু মল্লিকার ছবি—একা মল্লিকার, আর কারও নয়। ছেলেবয়সের মল্লিকা থেকে ফুলশয্যার মল্লিকা ; পাঁচ বছর বয়স থেকে বাইশ বছরেব মল্লিকা। ফ্রক-পরা বিনুনি-ঝুলনো মেয়ে পুতুল-হাতে দাঁড়িয়ে, ফুলের টবের পাশে কোনটা, কখনও স্কুল যাচ্ছে, কোনটা বা বালিশ-বুকে কিশোরী মেয়ে গালে হাত দিয়ে মুখ তুলে চেয়ে রয়েছে। এমনি সব। আরও অনেক। কিশোরী থেকে যুবতী। বটানিক্‌সের বাগানে, গঙ্গার জেটিতে, রাঁচির কোন ঝর্‌নার পাশে, ফুলের গা জড়িয়ে, পাতার ঝোপের মধ্যে, গাছের ছায়ায়। নিজের জীবনের টুকরো-টুকরো ছবিগুলো আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে—একটি মেয়ের ইতিহাস যেন। এবং সম্পূর্ণ একার।

'তোর বউএর তো ফটো তোলামোর শখ বড়!' বললে সরোজ।

'হ্যাঁ, ওই এক নেশা!' পুষ্প কেমনতর এক হাসি হাসল।

মল্লিকা এল। অ্যালবাম দুটো তুলে নিয়ে শুধালে, 'কেমন দেখলেন ?'

'চমৎকার! শুধু আপনার ছবিই!'

'আর কার থাকবে ?' মল্লিকা উজ্জ্বল চোখে তাকাল। গলার স্বরটা একটু ধারালো।

'তা ঠিক!' সরোজের সন্দেহ হল, বেফাঁস কোন কিছু বুঝি বলে ফেলেছে। চালাক ছেলে, কথাটা ঘুরিয়ে নিতে একটুও কষ্ট হল না।

বললে, 'নিজেকে নিজেই দেখা ভাল। যত বয়স বাড়বে, ততই এই পিছু-ফেলে-আসা দিনগুলোর ছবি ভাল লাগবে—কত কথা মনে পড়বে।' সরোজ বেশ সহজ ক'রে নিল অবস্থাটা।

মনে হল, খুশী হয়েছে মল্লিকা।

এর পর মল্লিকাকে খুশী করার জন্যে সরোজ একটা আকর্ষণ বোধ করবে, আর মল্লিকা হঠাৎ প্রজাপতির মতন লঘু, চপল, বর্ণবহুল রূপটিকে খুলে মেলে ধরতে চাইবে দিনে দিনে, এটা ওরা কেউই ভাবে নি। না সরোজ, না পুষ্প। মল্লিকাও নয় বোধ হয়।

এতটা হাল্‌কা ছিল না মল্লিকা। ওর চলাফেরায়, কথা বলায় সংযত একটা ভঙ্গি ছিল। কেমন একটা বেড়া ছিল কোথাও। জোরে কথা বলত কদাচিৎ, খিলখিল হাসি হাসতে হঠাৎ যদি শুনে থাকে কেউ। নয়তো একটু গম্ভীরই ছিল ও, সাজপোশাকে শিষ্টতা ছিল। মেলামেশা ছিল না বড় একটা। একা-একা নিজের মধ্যে নিজেকে ধরে রেখেছিল মল্লিকা।

সরোজ আসার পর গত দু মাস ধরে একটু-একটু ক'রে, আস্তে আস্তে সব যেন মিলিয়ে আসছে। এখন মেলামেশা বেড়েছে। বেশ বেড়েছে। যদিও সেটা সরোজের সঙ্গে। আজকাল দিব্যি সামনাসামনি বসে ওরা গল্প করে। হাসিতে ঢেউ তুলে তুলে। কখনও রাগ, কখনও অভিমান। চপলতাও প্রকাশ ক'রে ফেলে। ভাল ক'রে সাজে, রং বদলে বদলে শাড়ি-ব্লাউস পরে, খোঁপার ছাঁদ বদলায়, কাজল দেয় চোখে, তিল আঁকে চিবুকে। তা ছাড়া আরও আছে। হৈ-হুট ক'রে বেরিয়ে পড়ে বাইরে। পুষ্প থাকল, থাকল ; না থাকল তো নয়। আজ আউটরাম ঘাট—সূর্য যখন ডুবছে, তখন সেই পড়ন্ত বেলায় ছবি তোল একটা। দক্ষিণেশ্বরের

গঙ্গায় জলে পা ডুবিয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকলে সেই সময়ের ফটো। ভিক্টোরিআ মেমোরিআলের সামনে, ঘাসে শুয়ে।

প্রথম-প্রথম ব্যাপারটা পুষ্পর চোখে একটু-আধটু বিসদৃশ ঠেকলেও তেমন মারাত্মক বলে মনে হয় নি। পুষ্প ভেবেছিল, এই হঠাৎ আতিশয্য এবং উন্মাদনা বেশি দিন থাকবে না মল্লিকার। সরোজও সৌজন্যের ঢিলে রাশ সামলে নেবে। কাজেই, চুপ ক'রে থাকাই ভাল। তা ছাড়া, কি বলবে মল্লিকাকে এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে! বললেও কি ভাববে ওরা পুষ্পকে! কাজেই, পুষ্প চুপ ক'রে ছিল। এবং চুপ ক'রে আড়াল থেকেই দেখছিল সব।

পরে পুষ্পর মনে হতে লাগল, ওরা—মল্লিকা আর সরোজ, তার স্ত্রী এবং তার বন্ধু—পরস্পারের সঙ্গে যতটুকু শিষ্ট, সহজ, সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখলে শোভন হত, বলার কিছু থাকত না, আপত্তি করার কথাই উঠত না, তার অনেক বেশি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং জটিল অবস্থা গড়ে তুলেছে। তুলছে। হ্যাঁ, সোজাসুজি স্পষ্টাস্পষ্টি না হলেও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, ইঙ্গিতে-আভাসে কথাটা এর পর তুলতেই হল পুষ্পকে। মৃদু, ক্ষীণ অভিযোগ জানাতে হল।

আর মল্লিকার মনে হল, তার স্বামী অত্যন্ত ইতর একটা সন্দেহ মনে পুষছে। নানা রকম নোংরামি, গোঁড়ামি। এরকম হয়। এসব লোকের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে সংকীর্ণতার অজস্র পোকা কিলবিল ক'রে ঘোরে; তার আকাশটা আকাশ নয়, ঘরের ছাদ—যেখানে হাত-পা মেলার অবকাশ নেই, মন ছড়িয়ে দেখার মত স্থান কিংবা খাওয়াদাওয়া, ঘুম, আর ঘর-কাছারির প্রাত্যহিক অভ্যাস ছাড়া আর কিছু, অন্য কিছু—যা ভাল লাগাতে পারায়, ভাল লাগায়, স্বপ্ন সুখ খুশি আনন্দের জন্যে মনকে মিহি ক'রে গুনগুনিয়ে রাখে।

'আমার নিজের একটা ভাল লাগা আছে!' মল্লিকা বললে গলার স্বরটা মৃদু হলেও কঠিন।

'আমি কি অস্বীকার করছি!' পুষ্প শান্ত গলায় জবাব দিল, 'তোমার যা ভাল লাগে, তুমি কর। কিন্তু দৃষ্টিকটু ঠেকে, এমন কিছু নাই বা করলে!'

'দৃষ্টিটা সকলের সমান নয়; চোখের দোষও থাকতে পারে কারও!' মল্লিকার ডাগর চোখে আগুনের হল্‌কা। ঠোঁটটাও কাঁপছিল।

'ওসব তর্ক ক'রো না!' পুষ্প অসহিষ্ণু, অধৈর্য হচ্ছিল ক্রমেই। গলার স্বর পাল্‌টে যাচ্ছিল। বেশ একটু তিক্ত কণ্ঠেই বললে, 'সিনেমা-থিয়েটারের মেয়েদের মতন অর্ধেক গা খুলে ফটো তোলানোটা সুরুচির পরিচয় নয়!'

চমকে উঠল মল্লিকা। পা দুটো কেঁপে গেল একবার। কেমন একটা চূড়ান্ত উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ পাথরের মতন ভার লাগল। আর, মনের মধ্যে ভাবনাচিন্তাগুলো হঠাৎ-থেমে-যাওয়া রেলগাড়ির মতন থমথম ক'রে উঠল। একটুক্ষণ এইরকম। তারপর নির্বাক, নিস্পন্দ মল্লিকা ঝড়ো-বাতাস-লাগা শীর্ণ গাছের মতন থরথরিয়ে উঠল। আর, চোখের পলকে তার চেহারাটা থ্যাপাটে হয়ে উঠল—চোখমুখ, কথাবার্তায় অসহ্য ঝাঁঝ, বিশ্রীরকম ভঙ্গি।

'গা খুলেই আমি ছবি তোলাব—তোলাব! আমার গা আছে!' যেমন তীক্ষ্ণ মল্লিকার গলার স্বর, তেমনি তীব্র তার দৃষ্টি।

'আছে বলেই একটা রাস্তার লোক দু-বেলা এসে চোখে তাই চাটছে!' পুষ্পের বাঁকা ঠোঁটে ধারালো ব্যঙ্গ। বলতে বলতে মুখটা ও অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল।

থতমত খেয়ে একটুর জন্যে চুপ ক'রে পরক্ষণেই জবাব দিল মল্লিকা,

'তার চোখ তোমার মতন নয়।'

'তাই নাকি! সরোজের চোখে বুঝি ঠুলি পরানো আছে?' পুষ্পর ধারালো হাসি মল্লিকার গা যেন ছুরি দিয়ে চিরে দিল।

ঘর ছেড়ে চলে গেল পুষ্প। তার আর সহ্য হচ্ছিল না।

মল্লিকা আস্তে আস্তে গিয়ে বিছানায় বসল। বসেই থাকল। বুকটা জ্বলছিল, টন্‌টন করছিল কণ্ঠার কাছটা। বালিশ টেনে বুকে চেপে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল অবশেষে।

তারপর একটু-একটু ক'রে যখন ছোবল-তোলা মনটা খানিক গুটিয়ে এল, নিস্তেজ হল, তখন একটা কথাই বেশি ক'রে মনে পড়ছিল মল্লিকার এবং ও ভাবছিল। পুষ্প অবশ্য বিশ্বাস করে নি, বিদ্রূপ ক'রেই বলেছে, সরোজের চোখে কি ঠুলি পরানো আছে? মল্লিকা কিন্তু জানে, ঠুলি পরানো না থাকলেও সরোজের চোখে অন্য জিনিস মাখানো আছে। কি বলবে তাকে মল্লিকা, কি নাম দিতে পারে? হ্যাঁ, একরকমভাবে বলা যায়, সে চোখ.ক্যামেরার লেন্স। জায়গামতন যা শুধু আলোছায়াকে বিচিত্র আশ্চর্য রহস্যের যাদু মাখিয়ে ধরতে পারে। সরোজ তাই। মানুষ, গাছপালা; পশুপাখি, নদী, সকাল-সন্ধ্যে, ফুল-পাতা—এসবের মধ্যে যে আশ্চর্য রূপটি লুকিয়ে রয়েছে, ধরা দিয়েও আড়াল-দেওয়া রহস্য, অন্যের চোখে যা পড়ে না, পড়বে না, সরোজ টুক্ ক'রে এক লহমায় সেইটিই তুলে নেবে। সে ক্ষমতা তার অসাধারণ; অনন্যসাধারণ পটুত্ব। এর কম বা এর বাইরে কি আর কিছু সরোজ? মল্লিকা ভেবে পায় না, ভাবতে চায় না। লোকটা তার কাছে মূল্যবান একটা ক্যামেরা ছাড়া আর কি! আর মল্লিকাকে, মল্লিকার জীবনের এই টলমল, কূলভরা যৌবনের নানা মুহূর্তকে সে শুধু ধরে দেবে কাগজে—সাদা-কালোয়, কদাচিৎ রঙেও। শুধু মন দিয়ে কতটুকু আর মল্লিকা ধরতে পারে,

অসংখ্য মুহূর্তের ক'টিকেই বা! শুধু সেজন্যেই সরোজ। এ ছাড়া, বলতে কি, ওই একটিমাত্র মানুষ, যে পাকা ডুবুরির মতন ওর দেহ-মনের সমুদ্র থেকে আশ্চর্য আশ্চর্য রত্ন উদ্ধার ক'রে আনতে পারে। মল্লিকা নিজেই জানে না যা, কল্পনাও করতে পারে না, সরোজ পলকে তাই ছোঁ মেরে তুলে ধরে। হ্যাঁ, ওই পারে কালবৈশাখীর ঝড় উঠলে হঠাৎ বেহালার এক মাঠে আলুথালু গাছপালা আর ডানা-ঝাপ্টানো বকপাখির দল যখন হাওয়ার গতিতে আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, তখন এলোচুলে কিলবিল-করা কপাল-গলাকে একটু বাঁকাভাবে উঠিয়ে দিতে, আকাশমুখী চোখ করিয়ে আশ্চর্য একটি ছবি তুলে নিতে। যার প্রোফাইলে সেই আসন্ন ঝড়ও থমথম করে। সে মুখের চোখ দুটির পাতাও যেন বকপাখির চঞ্চল ডানার ব্যাকুলতাটুকু মেখে নিয়েছে। এমনি সব, কত কি। সেদিন যেমন দমদমের দিকে বেড়াতে গিয়ে এক ফাঁকা বাগানবাড়ির ঝিলের জলে সরোজ একটা ছবি তুলল। শালুক, পদ্ম ফুটেছিল জলে—পাতা, খড়কুটো ভাসছিল। সরোজ বললে, জলে নাম। একটা ডুব দিয়ে নাও। তারপর ওঠ, শুধু ভেজা মাথাটুকু ভাসিয়ে রাখ জলে। পড়ন্ত বেলার রোদ আছে, ছায়াও। আমি আর একটা জলজ কুসুমের ছবি তুলে নি। জলে নামল মল্লিকা। ছবি উঠল। দেখে নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে মন চাইছিল না। সত্যিই, অপূর্ব সুন্দর একটি জলজ পুষ্প হয়ে ফুটে উঠেছে মল্লিকা। কি কোমল, মসৃণ, আর স্নিগ্ধ-সজল।

বলতে কি, মল্লিকাকে যে এমনি ক'রে নিত্যনতুন রূপে আবিষ্কার করছে এবং সেই আবিষ্কারের ফলটুকু দিয়ে ধন্য করছে মল্লিকাকে, তৃপ্ত করছে, তাকে মল্লিকা আর কি ভাবতে পারে এক আলো বা এক যাদুকর ছাড়া! হ্যাঁ, তাই। কত না অন্ধকার, অদৃশ্য গুহাশিল্পের মধ্যে খুঁজে খুঁজে সরোজ আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে দপ ক'রে; উদ্ভাসিত হয়ে

গেছে বিচিত্র কারুকর্ম মল্লিকার, মল্লিকার দেহবল্লরীর, অন্তরের অঢেল ঐশ্বর্য! যাদুকরের মতন ওই মানুষটি মল্লিকার চোখে মল্লিকারই চোখ, গলা, চুল, কপাল, স্তন, কটি, বাহুর কত না যাদুকে উন্মোচিত ক'রে মুগ্ধ ক'রে দিয়েছে তাকে! এবং মোহিত হয়েছে নিজেও।

রাস্তার লোক এসে তাই চাটছে—স্বামীর কথাটা মনে পড়ল আবার মল্লিকার। সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য ঘৃণায় মুখটা বিকৃত ক'রে উঠল ও। ছি, ছি—কি ইতর পুষ্প! তার নিজের চোখে যেহেতু ভিখিরির মত দীনতা, পশুর মতন বিশ্রী ক্ষুধা, লেহনে যার ক্লান্তি নেই, জুড়ি নেই এবং যার চোখ শুধু ধবধবে মাংসর নরম মসৃণ স্পর্শটুকু নিয়ে রক্তের মধ্যে তপ্ত উন্মাদনায় ইন্দ্রিয়নিচয়কে শুধু টঙ্কার দিতে চায়, সেই লোক অন্যকে বলে, বলেছে—চাটছে, গা চাটছে মল্লিকার। আসলে, গা চাটছে মল্লিকার কর্কশ জিভ দিয়ে ওই লোকটা—যে তার, তার জীবনে হঠাৎ স্বামী হয়ে এসে পড়েছে।

মল্লিকার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল এবার। ভাবতে ভাবতে। তার কথা, সরোজের কথা এবং স্থূলরুচি, নিম্নদৃষ্টি, অতি-সাধারণ এক স্বামীর কথা ভেবে। লোকটার নিজের চোখেই ঠুলি আঁটা এবং একটি কচ্ছপের মতন যে নিজের ভক্ষ্যবস্তু ছাড়া আর কিছুই বোঝে না—বর্ণ, গন্ধ, রূপ, রং, স্বাদ নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে ক্ষমতাও নেই।

চোখের জলে ঝাপসা দৃষ্টি—তাকিয়ে তাকিয়ে পালঙ্কের কোণে ব্যাটম থেকে ঝোলানো ছোট্ট বেড-সুইচটা দেখছিল মল্লিকা। আর, অন্য-মনস্কভাবে হাত তুলতে চাইছিল সুইচটা ধরবার জন্যে। অন্ধকারে এক-ঘর আলো দপ ক'রে জ্বালিয়ে দিতে পারে ওটাও।

স্বামীকে এর পর মল্লিকা ঘৃণাই করতে শুরু করেছিল। তার হাবভাবে

দিন-দিন অবহেলাটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। যেন কিছুই আসে-যায় না মল্লিকার, পুষ্প কি ভাবল আর না-ভাবল, বলল কি না-বলল। ও ওর মতনটি ক'রে থাকবে, খুশিমত।

মল্লিকার উপেক্ষা পুষ্পর আরও অসহনীয় হয়ে উঠছিল। অভিযোগ বাড়ছিল। আর আগের মতন মুখ বুজে থাকতে পারত না পুষ্প। বলত, বলে ফেলত। কথা কাটাকাটি হত স্বামীস্ত্রীতে। কলহ, মন-কষাকষি লেগেই ছিল। যেন ওদের মধ্যে কেউই আর অন্যকে সহ্য করতে পারছে না।

পুষ্প একদিন বললে, সরোজকে সে তার বাড়ি আসতে নিষেধ ক'রে দেবে। জবাবে মল্লিকা জানাল, সরোজের দোকানের দরজাটা তো আর বন্ধ হয়ে যাবে না, আর মল্লিকা খোঁড়া হয়েও যায় নি!

আর একদিন স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বড় রকমের এক ঝগড়া হয়ে গেল মল্লিকার এক ছবি নিয়ে। ড্রেসিং টেবলের এক পাশে কোণাকুণি ক'রে রেখেছিল ছবিটা মল্লিকা। চোখে পড়তেই ফ্রেম সমেত ছবিটা টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল পুষ্প।

'ওটা ফেলে দিলে যে বড়!' মল্লিকা দপ ক'রে জ্বলে উঠে কৈফিয়ত চাইল।

'বেশ করেছি! ভদ্রঘরের বউ তুমি—বেশভূষার একটা শ্রী থাকবে তোমার! কি ছবি ওটা—মাথায় নেই ঘোমটা, সিঁথির দাগটুকু পর্যন্ত না! চুড়ো ক'রে চুল বেঁধে ফুল গুঁজেছ—গলায় মালা! দেখলে গা ঘিনঘিন করে!'

'করুক! আমার ছবি—আমি রাখব।' মল্লিকা ছবি কুড়োতে যাচ্ছিল।

পথ আগলাল পুষ্প।

'না। ও ছবি কিছুতেই তুমি রাখতে পাবে না!' পুষ্প চিৎকার ক'রে উঠল।

মল্লিকা তবু পথ করবার চেষ্টা করলে। পুষ্প কঠিন মুঠোয় হাত ধরে ফেলল মল্লিকার।

'ছাড়!' থরথর ক'রে কাঁপছিল মল্লিকা।

'না। এ ঘর তোমার একার নয়, আমারও!' পুষ্পর সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলছিল, 'ছবি যদি রাখতেই হয়, একা তোমার নয়, দুজনের ছবিই রাখতে হবে! তোমার-আমার দুজনের।'

মুঠো আলগা করলে পুষ্প। ভীষণভাবে চমকে উঠে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে গেল মল্লিকা। চোখ তুলেই পরক্ষণে নামিয়ে নিলে। একটু পরে আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেল।

ভুলল না পুষ্প কথাটা। বরং ভেবে দেখলে, এটা একটা চমৎকার বিদ্রূপ হবে। সরোজ আর মল্লিকার চোখের সামনে বিষকাঁটার মতন বিঁধে থাকবে তাদের যুগল-মূর্তি। পীড়া দেবে ওদের। মানসিক অস্বস্তি বোধ করবে ওরা দুজনেই।

যতই ভাবছিল, ততই একটা ইতর আনন্দ মনটাকে উত্তপ্ত করছিল। ক্ষুরধার কেমন এক প্রতিহিংসা ধিকিধিকি ক'রে জ্বলছিল চোখে। আর পুষ্প ভাবছিল, যদিও নাটকীয় হল, তবু পরিহাসটা চমৎকার। সরোজের স্টুডিওতে তোলা পুষ্প-মল্লিকার যুগল-ছবিই এখন ওই নতুন প্রেমিক-যুগলের অনেক গোপন, একান্ত,অন্তরঙ্গ মুহূর্তকে নিঃশব্দ বিদ্রূপে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে দেবে।

কিন্তু আশ্চর্য, ফটোটা এবারও পাওয়া গেল না! মল্লিকার কথায় বিশ্বাস না ক'রে পুষ্প নিজেই সব জায়গা হাতড়াল। বাস্তবিকই, ছবিটা নেই। কোথাও নেই। মল্লিকার অ্যালবামে এবারও তার জায়গা হয় নি।

পুরো একটা দিন নিজের মধ্যে জ্বলে-পুড়ে মরেছে পুষ্প এর পর। তারপর কোথাও যেন একটা সান্ত্বনা খুঁজে পেয়ে হঠাৎ চুপ ক'রে গেছে। আর আশ্চর্য এই যে, যতখানি দাঁত-নখ বের ক'রে হিংস্র, উন্মত্ত হয়ে ও এগিয়ে এসেছিল মল্লিকার কাছাকাছি—সব অকস্মাৎ গুটিয়ে নিয়ে অদ্ভুত শান্ত এবং নিস্পৃহ হয়ে ও সরে গেল; দূরে সরে থাকল।

পুষ্প-মল্লিকার সংসারের আবহাওয়াটা শান্ত হয়ে এল আবার। অদ্ভুত ধরনের এক নিঝুম নিস্তব্ধতা। যেন একজনের অস্তিত্বটা শবের মতন পড়ে আছে, আর একজন ঘুমিয়ে—গাঢ় ঘুমে।

এক বৃষ্টির দিনে, বাইরে বারি ঝরঝর, আকাশে স্লেট রং, গাছপালা ভিজছে, কাক-চড়ুইএর দল ভেজা পালক ঝাড়ছে, সন্ধ্যে নেমেছে—এমন সময় ও-বাড়ির শান্ত আবহাওয়া হঠাৎ দু টুকরো ক'রে কেউ যেন কেটে নিল। গাঢ় ঘুম থেকে চোখ মেলে মল্লিকা ভয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠল। সেই আর্তনাদ, তীক্ষ্ণ এবং করুণ গোঙানি, ভীত ব্যাকুল প্রশ্নগুলো ঘরের বাতাসে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল। না, পুষ্প বাড়ি ছিল না। সরোজ ছিল। সামনেই। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েছিল। কাঁধে স্ট্র্যাপে বাঁধা ক্যামেরাটা ঝুলছে। খাপ-খোলা তলোয়ার নয়। খাপে বন্ধ। যাবার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিল সরোজ।

মল্লিকা তখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না পুরোপুরি। পাংশু মুখ, অসংবৃত বসন, জল উপচে পড়েছে চোখ বেয়ে। দৃষ্টি ঝাপসা। গলা কাঁপছিল, গা কাঁপছিল, নিশ্বাস দ্রুত।

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!' ভাঙা কান্না-জড়ানো স্বর মল্লিকার।

'আগেই তোমার বুঝতে পারা উচিত ছিল!' সরোজ অন্য দিকে মুখ

ফেরাল।

অসম্ভব চাপা সুরে কথা বলছিল সরোজ।

'পারি নি। মনেও হয় নি। অন্য কিছু ভেবেছিলুম। কিন্তু ও কথা থাক্। সত্যিই কি আর তুমি আসবে না?'

'না।'

'আমার ছবি?'

'আমি পারব না।' সরোজের কথাটা রূঢ়ভাবে কানে বাজল। কিন্তু সরোজ সত্যিই আর তাকাতে পারছিল না মল্লিকার দিকে, মল্লিকার দেহের দিকে। একটা বিস্বাদ স্পর্শ যেন একতাল ছায়া হয়ে পড়ে আছে ওই শরীরে। যাদুকরের চোখ সরোজের। ধরে ফেলেছে। জেনে ফেলেছে। ওর ক্যামেরার লেন্সটা ঘোলাটে হয়ে গেছে সেই মুহূর্তে। ছবি আর ধরা পড়বে না সরোজের ক্যামেরায়।

'চলি।' সরোজ পা বাড়াল।

'আর তো আসবে না!' মল্লিকা ককিয়ে কেঁদে উঠল।

'প্রয়োজন কি?' সরোজ মুখটা নিচু ক'রেই বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। বাইরে তখনও ঝিরঝির বৃষ্টি, দমকা হাওয়া। আর কেমন এক নিঃশব্দ অনুভূতির স্পর্শ-মাখানো।

বিছানায় উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল মল্লিকা। সারা গা সেই কান্না মেখে অসহায়ভাবে বালিশে, তোশকে, চাদরে মিলিয়ে রইল। বাইরে বৃষ্টি ঝরে গেল, হাওয়া বয়ে গেল, সন্ধ্যে শেষ হয়ে রাত এল।

বাতি জ্বেলে দিল না মল্লিকা ঘরের। অন্ধকারেই চুপ ক'রে শুয়ে থাকল। সমস্ত কিছুই এখন আর অসহ্য লাগছে। এই ঘর, বাড়ি, বালিশ, বিছানা, ঘড়ির টিকটিক। আর মল্লিকা বুকের মধ্যে তুঁষের

আগুনে জ্বলছিল। সর্বস্ব তার বিকিয়ে গেছে। নিঃস্ব এবং রিক্ততার দুঃসহ ভার পাকে-পাকে বেঁধে ফেলছে। মল্লিকা ভাবে নি, কল্পনাও করে নি—এভাবে সে ব্যর্থ হয়ে যাবে, যেতে পারে।

আরও কিছু সময় ভেবে ধীরে ধীরে উঠল মল্লিকা। প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে তাকে নিজেকে বাঁচাবার। বাইশ বছরের যৌবনকে পোকায় কেটে হতশ্রী বিবর্ণ করবে, কথনই তা সহ্য করবে না মল্লিকা!

শরীরটা দ্রুত ভাঙতে বসেছিল। খাওয়া-দাওয়া, ঘুম গেল। উগ্র একটা রুক্ষতা ফুটল মুখে-চোখে। গলার স্বর হল কর্কশ। আর, মল্লিকা থেকে থেকে হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে চিৎকার ক'রে উঠত। জ্ঞান হারাত। রাত্রে তন্দ্রার মাঝে উঠে বসে বিবশ বসনে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াত। আলো জ্বালত। আর দেখত নিজেকে। দেখে দু হাতে চোখ ঢেকে ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠত।

খবর পেয়ে মা এলেন—জামাইবাবু, দাদা-বৌদিরা। ডাক্তার দেখায় নি পুষ্প। কথাটা ও নিজের থেকেই বললে। ওঁরা আঁতকে উঠলেন। পুষ্প জবাব দিল, 'মল্লিকা সেটা পছন্দ করত না। তা ছাড়া—'

'কি তা ছাড়া?'

ওঁদের প্রশ্নের সাফ জবাব দিল পুষ্প, 'মেয়েকে আপনারা আপনাদের কাছেই নিয়ে যান। যা ভাল বুঝবেন, করবেন। সেটাই ভাল হবে।'

বাপের বাড়িতে এসে মল্লিকা আরও স্পষ্টাস্পষ্টি ধরা পড়ল। সকলের চোখে, সকলের কাছে।

ডাক্তার, ওষুধপত্র, টনিক, ডায়েট—কোনও কিছুরই ত্রুটি ঘটল না। তবু শেষ পর্যন্ত একটা বিশ্রীরকম অসুখ বাঁধিয়ে বসল মল্লিকা। এবং

সন্তান ভূমিষ্ঠ করাতে হল। নিজের শক্তি ছিল না মল্লিকার।

দীর্ঘ দু মাস শুধু বিছানায় একভাবে শুয়েই সকাল-সন্ধ্যে কেটে গেল। ভাল ক'রে দেখবার-ডাকবার মতন হুঁশই ছিল না মল্লিকার—প্রথম তিন-চার সপ্তাহ। তারপর একটু-একটু ক'রে সূর্যের আলো চোখে পড়তে লাগল, খানিকটা আকাশ। জানলা দিয়ে কখনও মেঘ, কখনও পাখি, কখনও তারা দেখে দেখে মল্লিকার মনের কুয়াশা কেটে আসতে লাগল ধীরে ধীরে। একটি-দুটি কথা ফুটল ঠোঁটে, দু-এক ঝিলিক হাসি, কখনও বা চুপিসারে গানের কলির গুনগুন।

সেদিন পুষ্প এসে মাথার কাছটিতে বসে দেখল, মল্লিকার চুল একটি লম্বা বিনুনি ক'রে বাঁধা। সিঁথিতে নতুন ক'রে সিঁদুর ছোঁয়ানো। মুখটায় বুঝি একটু পাউডার বুলিয়ে দিয়েছে বৌদিরা। চোখের কোণে কালিমা থাকলেও দৃষ্টিটা স্বচ্ছ, যদিও করুণ।

প্রথম একটা-দুটো কথার পর খানিকটা চুপ ছিল দুজনেই। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে মল্লিকা শুধাল, 'আমি তো দেখতেই পাই নি! আমার কাছে রাখেই নি! তুমি দেখেছ?'

'দেখেছি।' পুষ্প মুখ নিচু ক'রে চোখের তারা তুলে মৃদু কণ্ঠে বললে।

'শুনলাম, দিন বারো বেঁচেছিল!' মল্লিকা পুষ্পর মুখের দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, বারো দিন।'

আবার একটু চুপ।

'কেমন দেখতে হয়েছিল ছেলেটা?' মল্লিকার গলায় আগ্রহ।

এবার স্ত্রীর মুখে একটুক্ষণ চোখ রেখে কেমন এক অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পুষ্প। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ও।

'আসছি।' পুষ্প ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। হাতে অ্যালবামের খাতা।

খাতাখানা দেখেই চমকে উঠল মল্লিকা।

'ওটা এখানে?' অস্ফুট কণ্ঠে কি যেন বলতে গিয়েও পারল না মল্লিকা।

'তোমার ব্যবহারের জিনিস সবই এ বাড়িতে।' পুষ্প সামনে এসে দাঁড়াল।

আস্তে আস্তে পাতা উল্‌টে, শেষ পাতাটি খুলে পুষ্প অ্যালবামটি বাড়িয়ে ধরল।

মল্লিকা ভয়ে ভয়ে, বিহ্বল দৃষ্টিতে হাত বাড়িয়ে নিল অ্যালবামটা। আর তাকাল।

মাংসের গোলগাল একটি ছায়া অ্যালবামের একটি গোটা পাতা দখল ক'রে পড়ে আছে।

মাংসপিণ্ড—হাত-পা আছে, মুখও। কিন্তু নিছক একটি মানবশিশুর আভাস, স্পষ্ট অবয়ব নয়।

মল্লিকা তবু মুখের একটা আদল খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছিল। চোখের ভুরুতে, ঠোঁটে, নাকে। এবং মল্লিকার চোখে পুষ্পর মুখের একটু আদল যেন ধরা দিচ্ছিল।

কে তুলছে ফটোটা, কবে, কত দিনে—জিজ্ঞেস করবার জন্যে চোখ তুলে মল্লিকা দেখে, পুষ্প নেই। কখন নিঃশব্দে চলে গেছে। ঘরে ও একা। একেবারেই একা।

অবাক চোখে এদিক-ওদিক তাকাল মল্লিকা। কেউ নেই। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। অ্যালবামের ছবিটার ওপর আবার চোখ পড়ল। হাত রাখল মল্লিকা। হাত সরাল আবার। একটি পাতা উল্‌টে গেল।

মল্লিকার ছবি, শেষ ছবি—সরোজ যেটি তুলেছিল। আর একটা পাতা উল্‌টে ফেলল মল্লিকা—তারই ছবি, সরোজ তুলেছিল। একটি-একটি ক'রে পাতা উল্‌টে গেল মল্লিকা। নিজেকে, শুধু নিজেকেই, দেখল—নিজের ক'টি বছরকে, একান্ত নিজস্ব জীবনটিকে।

অন্য অ্যালবামটা কাছে নেই। দেখার দরকারও নেই। মল্লিকা জানে, তাতে কি আছে। একা—শুধু একা মল্লিকাই আছে। তার পাঁচ থেকে আঠারো কি কুড়ি বছরের নানা রূপ—নিজেকে ধরে রাখার, দেখার সুযোগ। সময় যা কেড়ে নিতে পারে নি। বাকিটা এই অ্যালবামে।

শিথিল হাতে খাতাখানা রেখে দিল মল্লিকা। চোখ দিয়ে দেখার আর কিছুই নেই, মনেই কত মুহূর্ত বেঁচে আছে এখনও। সেই পাঁচ থেকে এই বাইশ বছরের জীবন—হ্যাঁ, মল্লিকা এ জীবনকে ভালবেসেছিল। নিজেকে। শুধু নিজেকে। নিজের দেহ, রূপ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং নিজের আত্মাকেই—যা শুধু তার অবয়বে পরিস্ফুট হতে পেরেছিল। আর কাউকে মল্লিকা দেখে নি, দেখতে ইচ্ছেও করে নি। শুধু নিজেকেই দেখেছে; দেখেছে, আর মুগ্ধ হয়েছে; নিজের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। এতকাল নিজেকে ভালবেসেই মল্লিকা সুখী ছিল, ভাল-বাসতে কাউকে ও চায় নি।

না—মল্লিকার জীবনে, তার পাশে, আর কারও স্থান হতে পারে না। অ্যালবামেও না। আমার গাছের ফুলে অধিকার সবটাই আমার, তোমার না। পুষ্পর ছবি কুঁচিকুঁচি ক'রে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে মল্লিকা। ওর অ্যালবামে পুষ্পর জায়গাও নেই। হয় নি।

কিন্তু? মল্লিকা চমকে উঠল। চোখ নামাল। দুর্বল হাতটা বাড়িয়ে দিল আস্তে আস্তে। পাশেই পড়ে আছে অ্যালবামটা। হাত রাখল মল্লিকা, আস্তে আস্তে তালু ঘসল আল্‌তো ক'রে। কোথা থেকে

কে এল—যদিও মল্লিকা চায় নি, তবু এল ; জায়গা দখল ক'রে নিল সেই অ্যালবামে ; জুড়ে বসে থাকল। কি দুঃসাহস !

একেও ছিঁড়ে-খুঁড়ে টুকরো-টুকরো ক'রে উড়িয়ে দেবে নাকি মল্লিকা ? দিতে পারে। কিন্তু অ্যালবামের পাতা থেকে সরিয়ে ফেললেই কি জীবন থেকে সরাতে আর পারবে মল্লিকা ! আগেও চেয়েছে, পেরেছে কই ! সে ঠিকই এল, জায়গা জুড়ে নিল।

এল যদি, তবে থাকল না কেন ? মল্লিকা আচমকা যেন নিজেকেই প্রশ্ন ক'রে চমকে উঠল। তারপর গুমরে গুমরে কাঁদল। কেন থাকল না—জায়গা তো ছেড়েই দিয়েছিল মল্লিকা শেষ পর্যন্ত ! হেরে গিয়ে ? হ্যাঁ—তাই, তাই, তাই !

তবু থাকল না। বরং এমন আদলরেখে গেল, এমন লোকের—যাকে মল্লিকা চরম ঘৃণা ক'রে এসেছে। মল্লিকার হঠাৎ মনে হল, পুষ্প যেন সেই ঘৃণা আর উপেক্ষা-অবহেলার শোধ নিল।

আর মল্লিকা,এখন অ্যালবামটি তুলে নিয়ে কান্না-থরথর ঠোঁটে ছুঁইয়ে, বুকে বেদনার ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে নিজেকে নিজেই বলছিল, বলতে যাচ্ছিল, কি একটা কথা যেন ; কিন্তু বলতে পারল না। হঠাৎ এতকাল পরে একটি আশ্চর্য ছবি—না, ছবি নয়—একটি মানবীর বেদনার হাহাকার হয়ে বিছানার ওপর এলিয়ে শুয়ে থাকল।

সাদা-কালো

কালো চিকন দেহে ঢেউ খেলিয়ে, গা ঢলিয়ে হীরামণি খিলখিল ক'রে হাসছিল। সুখমণির গায়েই যেন টলে পড়বে। কুচিকুচি পাথর-সাদা দাঁতগুলো ঝিকমিক করছিল হীরামণির, গলার ভাঁজে পুঁতির মালাটা কাঁপছিল।

সুখমণিও হাসছে। তবে অমনভাবে হীরামণির মতন সাপ-কিলবিল গা ক'রে নয়। শাল-গলা বেঁকিয়ে, ঠেরিয়ে ঠেরিয়ে।

আর রাগ যত গাঁদরির। বেঁটে পুরুষ্টু শরীরটা গোঁজার মত শক্ত ক'রে দপ্‌দপে চোখে তাকিয়ে ছিল, নাক-ঠোঁট কুঁচকে। ঘেন্নায়, বিরক্তিতে।

যাকে নিয়ে এই হাসাহাসি, রাগ-বিরাগ, তার কিন্তু গ্রাহ্যই নেই—কে হাসল, কে চটল। হীরামণির দিকে একনজর তাকিয়ে পাতি-গুদোমের সামনে দিয়ে হনহনিয়ে চলে গেল শুকনা।

পাতির খালি টুকরিগুলো তুলে নিয়ে পিঠে ঝুলোতে ঝুলোতে, পটিটা কপালের ওপর টেনে হীরামণি আর সুখমণি চলতে লাগল। দু-পা পিছন-পিছন গাঁদ্‌রি।

হীরামণি, সুখমণি, কি গাঁদরি, কারই জানতে বাকি নেই, শুকনাকে আজ ঠাস ক'রে চড়িয়ে দিয়েছে ফুলমায়া মেলায়। পাতি তুলতে তুলতে ফুলমায়া জল খেতে গিয়েছিল। শুকনার কাজ জল দেওয়া মেলায় মেলায়, চৌপলে—পানি খাওয়ানো। সে মুন্সি, কি দফাদার নয়—

নেহাতই পানিওয়ালা। ভার বয়ে দু-টিন জল শিরীষ গাছের তলায় নিয়ে বসে থাকে। মেলার কাছেই। জল খেতে সামনে এলে জল দাও মগে ক'রে।

ফুলমায়াকে জল দিতে গিয়ে নাক-মুখ-চুল-গলা-বুক ভিজিয়ে দিয়েছিল রসিকতা ক'রে। ফুলমায়া জলের তোড়ে বিষম লেগে, কেশে, হাঁফিয়ে একসা। ফুলমায়াও অবশ্য রসিকতাটা ঠাওর ক'রে নিয়ে প্রথম-প্রথম হাসছিল, আর গালাগাল দিচ্ছিল। পরে যখন গায়ের ভিজে জামাটা দেখাচ্ছে আর চোখ পাকিয়ে কটাক্ষ করছে, শুকনা টপ্ ক'রে হাত বাড়িয়ে ওর বুক ছুঁতে গিয়েছিল। ঠাস্ ক'রে এক চড় কষিয়ে দিয়ে ফুলমায়া মেলায় ফিরে এসেছে তখন। আচ্ছা হয়েছে—সাদা রং, সাদা মুখ, সাদা বুকের ওপর কুত্তার মত লোভ শুকনার।

হীরামণি মজা পেয়ে হাসছিল, দৃশ্যটা মনে ক'রে। সুখমণি হাসছিল উচিত শিক্ষাই শুকনা পেয়েছে দেখে, বিদ্রূপ ক'রেই। কিন্তু গাঁদরি গোঁজের মতন শক্ত আর কঠিন হয়ে ছিল অসহ্য ঘৃণায় আর অপমানে।

অপমানটা ওর একার কিংবা হীরামণি-সুখমণিরই নয় শুধু—পুরুষদেরও। ভাবনাথ, ধরমপাল, হোলা, টুংলুরও। ওদের সবার, সকলেরই—যাদের রং কালো।

ফুলমায়াদের রং সাদা। চুনের মত সাদা নয়, দুধের মতনও না; তবু সাদাই, হলুদ-হলুদ সাদা। গাঁদরি বলে—অড়হর ডালের দানার মতন, রুগী বেড়ালের চোখের ঘোলাটে হলুদের মতন।

এরা—হীরামণি, গাঁদরি, টুংলুরা—মদেশিয়া। চা-বাগানের মদেশিয়া কুলি। রাঁচি, ছোটনাগপুর, লোহরডাঙা ইতিউতি থেকে এসেছে। রং কালো, কুচকুচে কালো; লম্বা গড়ন; গায়ের চামড়া, মাংস, মুখটুখ একটু চকচকে; গা-গতর পাথরের মতন শক্ত। আচার-বিচার, ভাব-

ভাষাও আলাদা। সাজপোশাকও। ওদের বসতি একসঙ্গে, আলাদা চৌহদ্দিতে। চা-বাগানের বাবুরা বলবে, মদেশিয়া কুলি-লাইন।

আর, ফুলমায়ারা পাহাড়ী। ওদের বলে—পাহাড়ী কুলি। নেপাল, ভুটানের পাহাড় থেকে নেমে ঠুকরে ঠুকরে এখানে এসে জুটেছে। বেঁটে-বেঁটে চেহারা—কি মরদ, কি মেয়ে—টাট্টু ঘোড়ার মত গাঁটাগুট্টো গড়ন, নাক বসা, চোখ ক্ষুদে-ক্ষুদে, পাতায় ঢাকা প্রায়, চ্যাপ্‌টা মুখ, কট্‌কটে গালের হাড়, রুক্ষ-রুক্ষ। রং সাদা, হলুদ-সাদা, রং-করা মাখনের মতন। আচার-বিচার, ভাব-ভাষা এদেরও আলাদা। বসতিও তফাত ক'রে। বাবুরা বলে, পাহাড়ী কুলি-লাইন।

মদেশিয়া সর্দার মদেশিয়া কুলিকামিন নিয়ে আলাদা চৌপলে মেলায় পাতি তোলায়; পাহাড়ী সর্দার পাহাড়ী কুলিকামিন নিয়ে অন্য চৌপলে, অন্য মেলায়। তবু কখনও কখনও পাতি তোলার কাজে এক হয়ে যেতে হয়, তেলজলে এক হওয়ার মতন। অন্তত মরদে মরদে—মেয়েতে মেয়েতে। আজ যেমন হয়েছিল। হপ্তা ভোর এখন হয়তো তাই হবে—হীরামণি, সোনামণি, গাঁদরিদের পাশে পাশে ফুলমায়া, বচনমায়া, দিল-মায়ারা পাতি তুলবে। আর, শুকনা পানি খাওয়াবে।

আগে মদেশিয়ার হাতে পাহাড়ীরা পানি খেতে চাইত না, মদেশিয়ারাও পাহাড়ীদের হাতে। এখন খায়। পানি, পান, নেশা —চল হয়ে গেছে।

তা হ'ক চল! তা বলে মদেশিয়া শুকনার চোখে কালো রং, কালো গা, কালো বুক কিছুই নয়। যা-কিছু ওই ফুলমায়াদের সাদা গায়ে! এমন চোখের চল এখনও হয়নি। ছুটো-একটা ছুটকো-ছাটকা এ-বাগান সে-বাগানের কেলেঙ্কারি কেউ কেউ জানে। সবাই নয়। মেয়ে বাছতে হয়, কালো রঙের মেয়ে বাছে।

পাতিগুদোম থেকে বেরিয়ে কারখানার ফটকের বাইরে এসে গজ-গজ করছিল গাঁদরি। পাথর-ছড়ানো ভিজে-ভিজে পথ দিয়ে যেতে যেতে বলছিল, 'ওটা শিয়াল—ওই শুকনাটা। মরদ নাকি আবার ও! মদেশিয়া মরদরা চড়চাপাটি হজম করার লোক নয়। টুঁটি টিপে জিভ বের করিয়ে দিত সঙ্গে-সঙ্গেই।'

কিন্তু কথাটা তা নয়—অত ছোট নয়, হাসি-তামাশাও নয়। শুকনা কুত্তার মতন সাদা গায়ের রস চাটতে গিয়েছিল। পাহাড়ী মেয়েটা ওর জিভে থুথু ছিটিয়ে দিয়েছে—সমস্ত মদেশিয়াদেরই গায়।

হীরামণি বললে, 'শুকনা হাটে ডিমসাবান কিনেছে, কালো টুপি। চেকনাই চড়াবে।'

সুখমণি ব্যঙ্গ ক'রে জবাব দিল, মানসচক্ষে শুকনার বিরাট তালিমারা নীল হাফ-প্যাণ্টটা দেখতে দেখতে, 'কানাটা আগে তালি বদলাক, চেকনাই পরে!'

থাকরগাছের তলায় কার যেন মুরগি পালিয়ে এসে কুটো খুঁটছিল। গাঁদরি তালি দিয়ে মুরগিটাকে উড়িয়ে দিতে দিতে বললে, 'শুকনাটা মুরগি—ও জবাই হবে একদিন।'

কারখানা থেকে গলাভাঙা ভোঁক্-ভোঁক্ সিটিটা এতক্ষণে বেজে উঠল। পেছনে দলে-দলে মদেশিয়া আর পাহাড়ী কুলিকামিন—পিঠে টুকরি ঝুলিয়ে, ক্লান্ত পায়ে হেঁটে আসছে। দু-একজন পুরুষের হাতে কলমছুরি, ফড়ুয়া। এক-আধজন বা খালি হাতেই। সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে পাম্পঘরের মেকানিকবাবু চোঁ-চোঁ চলে গেল।

গাছপালা কেটে-কুটে ডালপালা বোঝাই ক'রে একটা বয়েলগাড়ি আসছিল সামনে দিয়ে। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠছে চাকায়। পেছনে একরাশ পায়ের শব্দ আর বিচিত্র গুঞ্জন। ঝাপসা বিকেল। বাতাস

ভিজে-ভিজে। গাছে-গাছে ছায়াছায়ালি পথ। লতাপাতার বুনো গন্ধ। শিরীষের পাতা ঝরে পচছে, ঝাঁকড়া-মাথা পানিশাজের ডালে বুনো পাখি চিকিরচিক্ ডাক তুলে পাখা ঝাপটাচ্ছে পাতার অন্ধকারে।

গাঁদরি একবার পেছনে তাকিয়ে দেখে নিল, ফুলমায়ার দল আসছে কিনা। হ্যাঁ, আসছে। তবে সে দলে ফুলমায়া নেই। শুকনাকেও দেখতে পেল না গাঁদরি কোথাও।

হীরামণিরা ক' পা এগিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গ ধরতে একটু ছুটেই গেল গাঁদরি। হাঁটতে হাঁটতে বিড়বিড় ক'রে কি বললে যেন। মনে হল, বলছে—কানাটা এখনও হেদিয়ে মরছে পাতিগুদোম আর রংঘরে।

কথাটা কিছু মিথ্যে বলে নি গাঁদরি। ফুলমায়াকে কোথায় না খুঁজেছে শুকনা! পাতিগুদোম, ঘানিঘর, রংঘর, শুকলাই—মায় দাবাই-ঘরে পর্যন্ত। ঘানিঘর, কি রংঘরে যাবার কথা নয় ফুলমায়ার, বা অন্য কোথাও। তার সীমানা পাতিগুদোম পর্যন্ত। অবশ্য দাবাইঘরে যেতে পারত ফুলমায়া ওষুধ নিতে। তাও যায় নি।

গেল কোথায় ফুলমায়া? অবাক হচ্ছিল শুকনা। ছুটির সিটি বাজতে না-বাজতেই একেবারে হাওয়া!

কারখানা থেকে বেরিয়ে এল শুকনা সবার শেষে। কাউকেই আর যখন রাস্তায় দেখা যাচ্ছে না। শেষ দলটাও ইঞ্জিনঘরের সামনে দিয়ে মোড় ফিরে গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেছে।

একসার বাবু-কুঠি ডাইনে রেখে সোজা রাস্তাটা ধরে এগিয়ে চলল শুকনা। বাঁয়ে কাঁটাতারের বেড়া-দেওয়া একটানা বাগান। এ বাগানের পাতি এখনও তোলা হয় নি। পাতিটাও ভাল না।

হনহনিয়ে হাঁটছিল শুকনা। বাবু-কুঠি ছাড়িয়ে উঁচু-নিচু মাঠ, মাঠের

শেষে স্থপুরিবাগান। বাগান পেরিয়ে ছোটসাহেবের কুঠি। কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। সাদা রং চড়ানো। ফুলবাগান আর বিজলীবাতি। বাজা-কলে বাজনা বাজে, গান হয়।

বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে শুকনা অনেকখানি পথ পার হয়ে এল। গাছ-গাছালির অন্ধকারে কাঁচা রাস্তাটা চোখে দিশা লাগিয়ে দিচ্ছে। চাঁদের আলো ফিনফিনে, ছায়াই বেশি। কাঁচা পাতির বুনো গন্ধ বাতাসে।

ফুলমায়ার কথাই ভাবছিল শুকনা। মেয়েটা তার চোখে নেশা লাগিয়ে দিয়েছে। শুঁড়িখানার নেশার চেয়েও জোর নেশা, জবর নেশা। এক কুড়ি আর দু বছর বয়স হয়েছে শুকনার। ইতিউতি সে কম ঘোরে নি। কাঠচেরাই কলে কাজ করেছে, পাতি তুলেছে অন্য বাগানে, সাহেব-কুঠিতে মালির সঙ্গে মাটি কুপিয়েছে, মাল তুলেছে লরিতে, মোট বয়েছে হাটে-হাটে—মেয়ে সে কম দেখে নি! কিন্তু ফুলমায়ার মতন এমন আর নয়। মেয়েটার চেহারায় যেন আঠা লাগানো আছে, টান ধরে। দুলগাই সমান উঁচু, পাশাপাশি দাঁড়ালে শুকনার বুকের ওপর মাথা উঠবে না। কাঠের মতন খটখটে শক্ত নয়, আঁটসাঁট নরম-নরম গা-গতর। কবুতরের মতন। মুখচোখের রোশনাই আলাদা। সাহেব-কুঠির নানীদের মতন সাদা; সাদা মুখ, সাদা গা, সাদা হাত এই ফুলমায়ার।

ফুলমায়াদের এই গায়ের রঙের ওপর শুকনার ভীষণ এক ঝোঁক। আজ বলে নয়, অনেক দিন থেকেই। নিজের জাতের কালচে-রং চেহারা-গুলো মোটেই ভাল লাগে না শুকনার। নয়তো যামিনী, হীরামণি, স্থখ-মণির লিকলিকে লতার মতন হেলানো-ফেলানো ঢংঢাং ওর মন্দ লাগে না। কাকের মতন রঙেই সব খেয়েছে ওদের। চেহারায় টান নেই, নেশা নেই। তা ছাড়া, শুকনা খানিকটা সভ্যভব্য। ইতিউতি চরকি মেরেছে গতর খাটাতে। গির্জেঘরে গেছে। এখনও যায় বাগানের সেই টুকচা

মতন ছোট্ট গির্জাটাতে। মদেশিয়াদের ন্যাংটো-ন্যাংটো বেশভূষাও মোটেই বরদাস্ত হয় না শুকনার। মরদরা শুধু লেংটি পরে—বড় জোর একটা গামছা তার ওপর, আর মাদিগুলো খসখসে এক পাক কাপড়া। কালো গা, বুক, হাত, পা বেবাক খোলা। ভাল লাগে না শুকনার এসব। পাহাড়ী-দের কাছে নিজেদের একেবারে জংলী মনে হয়। ওদের মরদদের পোশাক-আশাক ভালই। মেয়েদের আরও ভাল। নোমাল, কাপড়া, কুর্তি, চুলো। গলায় আসলি সোনার কন্ঠি, আর কানে-হাতে স্থন, কলি, চুড়। শুকনা বেহুঁশ হয়ে দেখে, লোভ সামলাতে পারে না, একে-তাকে ডেকে ডেকে কথা বলে, কংকট খাওয়ায়, হাসাহাসি করে। ফুলমায়ার পিছু-পিছু বাগানের লরি চেপে বারো মাইল দূরের হাটে গিয়েছিল গতবার। হাটের দিনে ফুলমায়ার সেই সাজ আজও শুকনার চোখে লেগে আছে। সবুজ নোমাল মাথায়, গায়ের কুর্তিটা টকটকে লাল, ফেটি কাপড়াটা ফিনফিনে পাতি-পাতি আঁকা, পায়ে জুতি। ফুলমায়া কন্ঠি তুলিয়েছিল গলায়, হাতে চুড়, কানে স্থন। আর মুখটা তার ধপধপ্ করছিল, আঁট বুকটা চিতিয়ে ছিল। হাটের বাজারে ফুলমায়া একটা নীল চশমা কিনল, ফটো তুলল। ফটোর পয়সা দিয়েছে শুকনা। বারো আনা। একদিনের প্রায় গোটা হাজরিটাই। কি খুশী ফুলমায়া! ঘণ্টাখানেক ধরে সেই ভিজে-ভিজে ফটোটায় ফুঁ দিয়েছে, আর বারবার হেসেছে খিলখিল ক'রে। তারপর কুর্তির তলায় লুকিয়ে রেখে দিয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে শুকনা মাঠ শেষ ক'রে হাওয়াগাড়ির সড়কের কাছা-কাছি পৌঁছে গেছে যখন, হঠাৎ ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পিছু তাকাল। আশেপাশে। ঝাপসা চাঁদের আলোয় ঠিক ঠাওর করতে পারল না, কে ডাকছে।

রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামতেই টুনগাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল

ফুলমায়া।

সামনে এসে দাঁড়াতেই কলকলিয়ে হাসল ফুলমায়া। টুকরিটা নামিয়ে রেখেছে মাটিতে। সোজা পিঠে দাঁড়িয়ে, কোমর-বুক টান ক'রে।

ফুলমায়ার হাতটা খপ ক'রে ধরে ফেলল শুকনা।

টানল তো টানল, তাতে যেন কিছু আসে-যায় না ফুলমায়ার।

বিড়ি চাইল ফুলমায়া। শুকনা বিড়ি দিল। বিড়ি ধরিয়ে বুক ভরতি ক'রে ধোঁয়া গিলতে লাগল ফুলমায়া।

'টুকরি ঢেলে কোথায় পালিয়েছিলি তুই? তোকে ঘর-ঘর খুঁজলাম। এখানে কেন একলা তুই—এই মাঠে, ফাঁকায়?' শুকনা শুধাচ্ছিল।

নাক-মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে চোখ দুটো জ্বলজ্বলিয়ে তাকাল ফুলমায়া। মুচকি-মুচকি হাসি। 'তুই আসবি বলে মাঠে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম রে ছোঁড়া!'

শুকনা বিশ্বাস করলে না। বিশ্বাস করার মতন কথাই নয় এটা। সন্দিগ্ধ চোখে এপাশ-ওপাশ দেখতে লাগল।

টুনিগাছের বড়-বড় পাতার তলায় চাঁদের আলো ঝিলিমিলি কেটেছে। মাঠ ভরে ভিজে-ভিজে জ্যোৎস্না। ক'টা জোনাকি উড়ছে এদিক-ওদিক। ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

শুকনা এই থমথমে মাঠে ফুলমায়াকে একা-একা পেয়ে আর সামলাতে পারছিল না। চোখ জ্বলছিল, বুক জ্বলছিল, হাত দুটো কঠিন হয়ে আসছিল।

শুকনাকে ঠেলে দিল ফুলমায়া। 'তোর সরম নেই, হতভাগা! মেলায় গালে চড়িয়েছি; এবার নাক কামড়ে দেব, কান ছিঁড়ে দেব। যা—যা—পালা! ওই দেখ, পঞ্চবীর। দেখতে পেলে ভোজালি বসিয়ে দেবে।' ফুলমায়া বলছিল আর হাসছিল।

পঞ্চবীর। শুকলাইঘরের সেই জোয়ান পাহাড়ীটা। পাহাড়ী কুত্তার মতন চেহারা। কোথায় সে? শুকনা ভাল ক'রে ঠাওর ক'রে ক'রে চারপাশ দেখছিল। টুনিগাছের তলায় আলো-ঝিলমিল ছায়ায় ফুলমায়ার টুকরিটা পড়ে আছে। পঞ্চবীরকে দেখতে পেল না শুকনা।

শুকনা ভিতু নয়। তবে মদেশিয়াদের মতন রক্তও ওর গরম নয়। একটু যেন ভাবল। তার ঝাড়া-হাতপা—কিছু নেই কাছে। পঞ্চবীর যদি ভোজালি তোলে, শুকনা ঠেকা দিতেও পারবে না।

একটুক্ষণ চোখে-চোখে তাকিয়ে থেকে শুকনা ফুলমায়াকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল। বিড়বিড় ক'রে কি বলতে বলতে রাস্তার দিকে এগিয়ে চলল।

চলতে চলতে শুনছিল, শুনতে পাচ্ছিল, ফুলমায়া কলকলিয়ে হাসছে। ফাঁকা মাঠে হাসিটা ছড়িয়ে পড়েছে। পঞ্চবীরের ওপর আক্রোশটা এতক্ষণে দপ ক'রে মাথায় চড়ল।

দলবাহাদুরের মেয়ে ফুলমায়া। ফুলমায়ায় যত বয়স, বিশ সাল হবে প্রায়, দলবাহাদুর এই বাগানে। জোয়ান বয়সে এসেছিল, এখন প্রায় বুড়ো। একটা হাতে পক্ষাঘাত, চোখ দুটো প্রায় অন্ধই হয়ে গেছে। নদীর রাস্তায় এগুতে পাহাড়ী কুলিদের যে লাইন, তারই একটাতে থাকে। কাঠের পাতলা তক্তা, আর পাতা-ছাওয়া ঘর। কম্পানির দেওয়া খানিকটা জমি—জনার আর ডাল ফলায়, শাকসবজি সেই জমিতে। একটা গরু আছে খয়েরী রঙের। গোঁ-ধরা গাই। লোক দেখলে গুঁতোতে ছোটে। আর, ফুলমায়ার রোজগার। মেয়ের রোজগারটা শুঁড়িখানায় মদ গিলতে শেষ হয়ে যায়। নেশায় সারাটা দিন যেন ঘুমিয়ে থাকে দলবাহাদুর।

ফুলমায়ার বিয়ে হয়েছিল প্রথমে তেজবাহাদুরের সঙ্গে। দু শ' টাকা পেয়েছিল ফুলমায়ার বাবা দলবাহাদুর। টাকাটা ফুরিয়ে গেল মদের নেশায়, গরু কিনতে। মেয়ের কাছে টাকা নিতে যায়। এই নিয়ে ঝগড়া। তেজবাহাদুরের সঙ্গে। ফুলমায়াকে পরের দফায় স্বামী নিতে হল। ছিল ভক্তিমতী, হল পতিব্রতা। পতিব্রতা হয়েও ফুলমায়া রেহাই পেল না। চার দফা স্বামী পাল্‌টে হল পতিতা। এখন আবার বাবার কাছে। ফুলমায়ার যা চেহারা, তাতে পাহাড়ী জোয়ানগুলো লেলিয়ে থাকে। বিয়ে-শাদি করতেই যা এগোয় না। চার দফা স্বামী পাল্‌টেছে মেয়েটা। পতিতার পর আর কোনও বিশেষণ নেই তাদের সমাজে। পাঁচ দফার স্বামী হতে কেউ আর তাই এগুতে চায় না। দলবাহাদুর বেঁচে আছে। আবার ঝগড়া বাধবে, স্বামী পাল্‌টাবে ফুলমায়া। বিয়ে-শাদিতে কাজ নেই, ফুর্তিফার্তা করতে হলে এক-আধটা টাকা খঁসালেই হবে। ফুলমায়া তাতে বড় একটা অরাজি নয়।

আজকাল তাও বন্ধ হয়েছে। ফুলমায়াকে রাস্তাঘাটে ধরাই মুশকিল। একদিকে পঞ্চবীর, আগলে আগলে চলেছে যেন। জোড় বাঁধা দুটিতে। পঞ্চবীর না থাকলে অন্য একটা মদেশিয়া কুলি—শুকনা।

পঞ্চবীর সঙ্গে থাকলে কেউ কোনও কথা বলে না। সাহস পায় না। নিজেদের জাত তো—পাহাড়ী! বাঁধুক জোড়। ঈর্ষা-ঈর্ষা লাগে যা। নয়তো দোষ কি!

কিন্তু শুকনার সঙ্গে দেখতে পেলে পাহাড়ী ছোঁড়াগুলো যেন লেলানো কুকুরের মতন পিছু-তাড়া করে। গালাগাল দেয়, ঢিল ছোঁড়ে, তালি দিয়ে হাসে। মদেশিয়ারা থু-থু করে। শুকনাকে তারা বাতিল করেছে যেন। কেউ ডাকে না, কথাও বলে না প্রায়।

শুকনার কোনও কিছুতেই গ্রাহ্য নেই। ফুলমায়ার জন্যে ইজ্জত,

জাত—সব যেন বিলিয়ে দিয়ে বসে আছে। আরও পারে—ফুলমায়া যদি চায়।

কিন্তু ফুলমায়া যে ঠিক কি চায়—শুকনা বুঝতে পারে না। কতবার অন্ধকারে লুকিয়ে কুলি-লাইন থেকে পরের মুরগি ধরে দিয়েছে, শুঁড়িখানা থেকে মদ এনে সাদাশিগাছের ঝোপে বসে খাইয়েছে, পান-বিড়ি হামেশাই, রোজগারের পয়সা দিয়েছে গাঁট থেকে, হাটবাজার থেকে গালার কলি, পাথরের মালা।

তবু ফুলমায়ার মতিগতি ধরতে পারে না শুকনা।

সেদিন নিজের থেকেই ডাক দিয়ে নিয়ে গেল নদীতে। রবিবারের দিন। গুদোম, কারখানা—সব ছুটি। বল্লে, মাছ ধরব। মাছ নয়, পোকা।

সারা দুপুর ডিহা নদীর ছলছল জলের পাশে পাথরে-পাথরে কাটল। ঘোলাটে জল চলকাচ্ছিল ডিহার। শন্‌শন্‌ হাওয়া বইছিল। ইমলি, সাদশি, থাকর, লামপতি গাছের ছায়ায়-ছায়ায় ফুলমায়া ছুটছিল, বালিতে লুটোপুটি খেয়ে গড়াচ্ছিল। আর, ঝলক-তোলা হাসি, কলকল হাসি—হাসছিল। ডিহার জল ছোঁড়াছুঁড়ি ক'রে দুপুরটাও কেটে গেল।

বিকেলে আর নদী নয়, পথ। গাছপাছালির মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। বাঁশের ঝোপ, পানিশাজের ঝোপ। বুনো পাখি উড়ছে; দূরে বাগানের হাতি চলেছে কোথাও, টুংটুং ঘণ্টা বাজছে তার গলায়। বুনো ফুল। বুনো গন্ধ। বেশ সতেজ গন্ধ। বাগানের চা-পাতির নয়।

পাতির গন্ধ শুঁকে শুঁকে যেন ঘেন্না ধরে গেছে শুক্‌নার।

ফুলমায়া শুকনার হাত ধরে হাঁটছিল। গা ঘসছিল মাঝে-মাঝে। গা টলিয়ে ধাক্কা দিচ্ছিল।

বললে ফুলমায়া, 'জেঠা এবার মরবে। দু-দশ দিনের মধ্যে। তোকে শাদি করব। এই শুকনা, বুঝলি!'

বুকের রক্ত ছলাত ক'রে উঠল শুকনার। কুচকুচে কালো মুখে এক ঝলক রোদ এসে লেগেছে। বাঁ গালের লম্বা কাটা দাগটা খানিক যেন কুঁচকে উঠেছে। ফুলকি ঝরছে চোখে।

'এ বাগানে নয়। তোর বাপ মরলে এ বাগান থেকে আমরা পালাব, ফুলমায়া। বাগানে আর নয়। অন্য কোথাও কাজ খুঁজব। চা-বাগান একটা নরক।' ফুলমায়ার কোমর জড়িয়ে গলগল ক'রে বলছিল শুকনা।

খানিক পরে হঠাৎ তার খেয়াল হল, 'তা হলে পঞ্চবীর?'

'পঞ্চবীর?' ফুলমায়া কেমন এক ভঙ্গি ক'রে ফিক্‌ফিক্ হাসলে। চেপে চেপে। পরিহাস ক'রেই যেন। বীরই বটে! শুকলাইঘরে ফুলমায়ার সঙ্গে সেদিন রঙ্গ-রসিকতা করছিল খুব। ছোটসাহেব হঠাৎ সে ঘরে এসে পড়ে। তারপর আর কি? পঞ্চবীরের পেছনে জুতোর দু ঠোক্কর। জালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছিল পঞ্চবীর।

'আর তুই?'

'হাসছিলাম রে, হাসছিলাম!' ফুলমায়া বেআবরু হয়ে হাসছিল।

'পঞ্চবীর সেই থেকে চটেছে। আসে না আর আমার কাছে। বচনমায়া এখন উঠতি ছুকরি। নতুন পানি-পাওয়া পাতিগাছের মত। পঞ্চবীর তার কাছে ঘুরছে-ফিরছে।'

ফুলমায়া ছুটে ছুটে হাঁটছিল। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। সন্ধ্যে হয়-হয়।

বলছিল—পাহাড়ী মেয়েটা সাফসুফ কথা বলছিল, 'মদখোর বাপটা মরলেই হয়। আমার ভাবনা কি! তলব আছে, আর পাতিপয়সা। ঘি-দুধ খাব, আর আসল সোনার কণ্ঠি পরব গলায়। বুঝলি, শুকনা!

তোর কামাই তুই খাস।'

শুকনা এসব কথা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। পঞ্চবীর ছোট-সাহেবের জুতোর ঠোক্কর খেয়েছে, দৃশ্যটা মনে মনে দেখবার চেষ্টা করছে শুকনা, আর খুব খুশী হচ্ছে—খুব। আক্রোশটা যেন ছোটসাহেবের জুতোর ঠোক্করেই মিটিয়ে নিচ্ছে ও।

ফুলমায়া যেন দিন গুনে বলেছিল। পাঁচ দিনের মাথায় দলবাহাদুর সত্যিই মারা গেল। গেল তো গেল। ফুলমায়া কাঁদল না। একটা দিন পাতি তুলতে গেল না। পরের দিন থেকে আবার যে কে সেই। পাতির মরসুম—সেরপিছু তিন পয়সা। পিঠে টুকরি ঝুলিয়ে, ছেঁড়া ছাতিটা মাথায় দিয়ে ফুলমায়া চৌপল আর মেলায়-মেলায় ঘুরল।

শুকনার সঙ্গে বাগানে আর দেখা হয় না। শুকনা পানি দেয় এক চৌপলে, ফুলমায়া পাতি তোলে অন্য চৌপলে।

ছুটির ভোঁয়ে দেখা। ফুলমায়াকে দেখতে না-দেখতেই কোথায় যেন মিলিয়ে যায় বেশির ভাগ দিন।

কোথায় যায় ফুলমায়া?

শুকনা আবার একদিন ধরল তাকে সেই ছোটসাহেবের কুঠি পেরিয়ে টুনিগাছের তলায়। খুব নেশা করেছিল ফুলমায়া। নেশা ক'রে ভিজে মাঠে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। কুর্তিটুর্তিতে কাদাজল, এখান-ওখান ছিঁড়েছে। ফালি কাপড়টা পর্যন্ত।

ফুলমায়াকে কাঁধে তুলে তার ঘরে পৌছে দিল শুকনা।

ফেরার পথে পঞ্চবীরের সঙ্গে দেখা। বাজারের সামনে পানের দোকানে পাহাড়ী কুত্তাটা দাঁড়িয়ে ছিল চক্চকে চোখ নিয়ে। শুকনাকে দেখে পানের পিক ফেললে মাটিতে।

সবই দেখল শুকনা। বললে না কিছু। ছোটসাহেবের জুতোর

ঠোক্কর খেয়েও শালার গরম কমে নি। না কমুক। ফুলমায়ার ঘর ছেড়েছে, একদিন বাগানও ছাড়তে হবে।

পরের দিন ফুলমায়ার সঙ্গে দেখা। বাগানেই। এক ফাঁকে বাগানের ঢালু জমিতে পাতির আর শিরীষ গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল দুজনে। ফুলমায়া আর শুকনা।

'তোর মতলবটা কি রে, ফুলমায়া? বাপ মরল। মাস কাটল। পাতির মরসুমও শেষ। বাগান ছাড়বি—না, পচবি এখানে? এক ঘর, এক খাটিয়া করবি—না, করবি না?'

ফুলমায়া হেসে গড়িয়ে পড়ল কথা শুনে। বসা নাক, গোল চোখে রোদের ঝিলিক তুলে শুকনার কোমর পেঁচিয়ে ধরল হাতে।

'কাল পাতির পয়সা পাব। চল না কেন—কালই পালাই বাগান ছেড়ে!' ফুলমায়া সোহাগ জড়িয়ে বলছিল।

'কাল?'

'ডর লাগছে? কিসের মরদ তবে তুই?'

শুকনার আপত্তি কি? কাল পরশু, কি এক মাস এক বছরের আগেপিছুতে তার কিছু আসে-যায় না। এ বাগানে তার টান নেই কোথাও। ফুলমায়া বাদে। ফুলমায়া যদি আজ যেতে চায়, আজ—কাল যেতে চায়, কালই।

শুকনা রাজি।

'তবে কাল আঁধারি হলে আসিস।'

মাথা ঝাঁকাল শুকনা।

তৈরি থাকবে ফুলমায়া—তার ঘরে।

সত্যিই তৈরি ছিল ফুলমায়া। শুকনা বেড়া টপকে ঘরে এসে ঢুকেছে। রাস্তা জুড়ে সেই গরুটা শুয়ে ছিল। থমথমে অন্ধকার। শুকনা খুশীই

হচ্ছিল। সাত মাইল পথ হাঁটতে হবে—বাগানে-বাগানে, ঝোপে-ঝাড়ে। তারপর রেল-স্টেশন।

দড়ির খাটিয়ায় গা এলিয়ে বসে ছিল ফুলমায়া। কাঠের গোঁজে ডিবে জ্বলছে। সারা ঘরে কংকটের গন্ধ।

শুকনা ঘরের মধ্যে গা গলিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফুলমায়া সত্যিই তৈরি হয়ে বসে আছে। একবার এক খেল এসেছিল বাগানে। বাত্তির খেল। নাচ দেখেছিল শুকনারা সেই খেলে। অনেকটা সেই নাচওয়ালীর মতন। মাথায় লাল নোমাল। গলায় সোনার কণ্ঠি। কুর্তিটা চাঁদির মতন ঝিকমিক করছে। ফালি কাপড়টা সবুজ। ঝুন, কলি, চুড়—। ফুলমায়া আগুনের মতন জ্বলছে।

শুকনার লোভ হচ্ছিল, ফুলমায়াকে ঘানিঘরের পাতি পেষাইএর মতন পেষাই ক'রে ফেলে।

'চল।' শুকনা দু-পা এগিয়ে এসে ডাকল।

ফুলমায়া উঠল না। চোখের ইশারায় চুপ করতে বল্লে।

চুপ তো চুপ। শুকনা দাঁড়িয়ে।

খস্‌খস আওয়াজ বাইরে। শুকনা একটু সরে গেল। তাকাল।

পঞ্চবীর এসে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ী কুত্তাটা। লাল চোখ। থ্যাবড়া গোল মুখটা লোহার মত কঠিন আর কালো

পঞ্চবীর ভোজালি বের করছিল।

শুকনা অর্ধস্ফুট একটা শব্দ ক'রে পাশে তাকাতেই কাঠ-কাটা কুড়ুল পেল হাতের কাছে। খপ ক'রে তুলে নিল।

মুখোমুখি দুজন। পঞ্চবীর, আর শুকনা। পাহাড়ী, আর মদেশিয়া। সাদা, আর কালো।

পঞ্চবীর সাপের মত চোখ নিয়ে দেখছিল, ভোজালিটা কালোটার

গায়ে কোন্ মাংসের মধ্যে গেঁথে দেবে।

আর শুকনা তাগ করছিল, কুড়ুলের ফালাটা ওই সাদা শুয়ারের বাচ্চাটার মাথায় না ঘাড়ের পাশে বসিয়ে দেবে।

এগুতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল দুজনে। বাইরে আর একটা শব্দ। পায়ের শব্দ। জোর-জোর। ভারি। ছোটসাহেবের বাবুর্চি মাথা গলিয়ে দিয়েছে।

ফুলমায়া চোখের পলকে উঠে পড়ল। কলকলিয়ে হাসল। হাসতে হাসতে যেন উড়েই গেল। মুরগির মতন। ছোটসাহেবের বাবুর্চি যেতে যেতে বলছিল, 'সাহেব-কুঠিতে তোর জিন্দগি ভোর খানা-পরনা!'

ছোটসাহেবের জন্যে ফুলমায়া বাকি জীবনটা তো দিয়েই রেখেছে! ফুলমায়া হাসছিল। বাইরে লামপতির ডালে-ডালে হাসিটা ছড়িয়ে পড়ছিল।

আর, ঘরে তখনও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পঞ্চবীর আর শুকনা। পাহাড়ী, আর মদেশিয়া। হলুদ-সাদা গায়ের রং একজনের, অন্যজনের কুচকুচে কালো।

মুরগিটাকে মাঝ থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আরও বেশি ফরসা আর লালচে যে, আরও বেশি তাগদ যার।

ছোটসাহেবের কুঠির কাছে টুনিগাছের তলায় ফুলমায়াকে কতবার দেখেছে শুকনা, তার হিসেব এখন আর করছে না ও। পাহাড়ীটাকে দেখছে।

এর ভোজালি, ওর কুড়ুল।

আর, ঘরের ডিবেটা জ্বলছে।

ময়ূরী

আমাদের ময়ূরগঞ্জ মিউনিসিপালিটিতে এতকাল শুধু কাক-দাঁড়কাকেই দানা ঠোকরাতে আসত। এবার এল এক ময়ূর। আমরা যা কল্পনাই করি নি, করতে পারি নি।

ঠিক-ঠিক বলতে গেলে, ওটা ময়ূর নয়—ময়ূরী। মিউনিসিপালিটির আল্‌কাতরা-মাখানো, অল্প-উঁচু, টাল-খাওয়া, নড়বড়ে রিক্‌শটা কার্তিক মাসের এক শীত-শীত সকালে যখন বাজারপাড়ার মুখে এসে মোড় ঘুরছে, আমরা—ময়ূরগঞ্জের ক'টি যুবক—চায়ের কাপ থেকে ঠোঁট তুলে ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। চোখের পাতা পড়ছিল না আর। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে সকলেই আমরা ভাবছিলাম, ময়ূরগঞ্জ মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স এরিআর মধ্যে এই ময়ূরী কোথা থেকে এল! কেমন ক'রে!

রিক্‌শটা মোড় ঘুরে গেল। মাথা ঘুরে গেল আমাদেরও।

আর কথাবার্তা নেই, চায়ে চুমুক পর্যন্ত না; সিগারেট-বিড়ির আগুন নিভল।

শেষে সতু—আমাদের ময়ূরগঞ্জ ইউথ লিগের ফুটবল টিমের সেন্‌টার ফরোআর্ড—যেন অসম সাহসে বল নিয়ে প্রথমে মাঠে নামল হাই কিক্‌ ক'রে, 'পুলিন সামন্ত করেছে কি রে, অ্যাঁ—? দাইএর বদলে দিব্যি এক ছুঁড়ি আমদানি ক'রে ফেলল!'

বল যখন মাঠে পড়ল, তখন বাকি খেলোয়াড়দের আর বাধা

কোথায় !

'এ মাইরি অন্য কেউ হবে। হয়তো পুলিন সামন্তর কোনও রিলেটিভ—মিউনিসিপালিটির রিক্‌শ চেপে যাচ্ছে।' অশোক বললে।

'পায়ের কাছে তবে ওই টিনের কালো বাক্সটা কেন ? আমার তো মনে হয়, আমি যখন জন্মেছিলুম, তখনও ওই বাক্সটা আমার মাথার কাছে ছিল।' বীরু বললে মাথা হেলিয়ে, চোখ বন্ধ ক'রে—যেন তার জন্মক্ষণ স্মরণ করতে করতে।

ত্রিদিব—আমাদের ত্রিদিব—চেহারায় খাটো হলেও যার বুদ্ধি-বিবেচনা, আমরা ভাবতাম, বেশ প্রমাণ সাইজের, সেই ত্রিদিব বললে,'নিউ অ্যাপয়ন্ট্‌মেন্‌টে মিউনিসিপালিটি স্ট্যাটাস্‌টা বাড়িয়ে দিয়েছে বোধ হয়। এখন আর দাই-ফাই নয় ; মনে হচ্ছে—মিড-ওআইফ !'

'আবার মিড কেন, এক্কেবারে শেষ স্টেশনে গাড়ি থামিয়ে দিলেই তো পারিস !' প্রফুল্ল চোখের তারা এ-পাশ ও-পাশ সরিয়ে বলল।

আমরা হাসলুম।

কিন্তু কথাটা হাসির নয়। পরে সকলেই ভাবছিলাম, ময়ূরগঞ্জ মিউনিসিপালিটির সর্বময় পুরুষ পুলিন সামন্ত যাই করুক—রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টের বাতিতে যথেষ্ট কেরোসিন তেল দিক না-দিক, ময়লা-ফেলা গাড়ি আরও কিছু আমদানি করুক না-করুক, শ্মশানের মধ্যে টিনের চালা-দেওয়া একটা শেড তুলল কি তুলল না—তা নিয়ে আমাদের ইউথ লিগের কিছু আসে-যায় না ; কিন্তু এই মেয়ে—অমন ধবধবে ফরসা রং, নরম চেহারার মেয়েটিকে তুমি কোথা থেকে আনলে, কেমন ক'রে, কোন্ চাকরিতে, তা আমাদের জানা দরকার। তুমি তো বাপু এসবের পাত্র নও ! একটা ভাল ছাঁদছিরি আছে, এমন মেয়েটেয়ে জীবনেও আন নি ! ময়ূরগঞ্জের আবর্জনা শুদ্ধির সঙ্গে আমাদের চরিত্র পর্যন্ত

শুদ্ধি ক'রে চলেছ! এতকাল মিউনিসিপালিটির আলকাতরা-রাঙানো রিক্‌শয় বসে, পায়ের কাছে তোবড়ানো তোরঙ্গটা নিয়ে যারা যাতায়াত করত, তারা ছিল কাক, দাঁড়কাক—কালো, কুশ্রী-বিশ্রী, যেমন-তেমন, বয়স্থা; আর আমরা সবাই—সারা ময়ূরগঞ্জই বলত, দাই; মিউনিসি-পালিটির দাই। শুদ্ধ ভাষায় ধাত্রী। কিন্তু এমন সুন্দর, কচি, অল্পবয়সী মেয়েকে দাই বলতে তো আমরা পারব না! কখনই নয়!

'ধাত্রী নয়—ধাত্রী ওকে মানায় না। এক যদি বলা যায়, ইউথ লিগের ধ্যানশ্রী। ইউথ লিগের ধ্যানেই এই ময়ূরী যেন ছিল—উড়ে এসেছে ময়ূর-গঞ্জে।' আমি কাব্য ক'রে বললুম।

এই ধ্যানশ্রীর পরিচয়টা জানা যায় কি ক'রে—এখনই, সদ্য-সদ্য, টাটকা-টাটকি! আমরা ছটফট করছিলাম।

সতু বললে, 'ওআচ কর। কানা নীলে এখনই বাজারে যাবে—ধরবি তাকে। আমি আসছি বাজারটা সেরে।'

ঠিক! কানা নীলের কাছে খবর পাওয়া যাবে।

আমরা বলি, কানা নীলে; আসলে ওর নাম নীলরতন। একসময়ে ও এ শহরের মিড্‌ল ইংলিশ স্কুলের হাইজিন-টিচার ছিল। সবেই তখন ম্যাট্রিক টপকেছি আমরা। নীলে এল। বয়েস বেশি নয়। লম্বাটে চেহারা। আমাদের সঙ্গে খেলাধুলো করেছে, আড্ডাও মেরেছে। তখন আমরা কেউ-কেউ ওকে বলতাম—নীলু; কেউ-কেউ—নীলুদা।

ক' মাস পরে নীলু বিয়ে করল। ময়ূরগঞ্জের বাইরে। কোথায় যেন। বউ নিয়ে ফিরল। বাড়ি ভাড়া ক'রে সংসার পাতল। একদিন আমাদের সে নেমন্তন্ন ক'রে খুব খাইয়েছিল—তাও মনে আছে। ওর বউকে পর্যন্ত। বলতে লজ্জা হয়—নীলুর বউএর চেহারাটা কেমন যেন ছিল। আলো-করা সুন্দরী নয়; কিন্তু খুব টান-টান মেয়েছেলে—চুম্বকের মতন

টানত, গায়ে-গড়নে আঁচ ছিল।

বিয়ের ক' মাস পরে এক সকালে নীলুর বউ বেপাত্তা—নীলুর চোখে ছুরির খোঁচা। সারা মুখ, কাপড় রক্তে ভাসাভাসি। সদরের চৌকাঠে মাথা দিয়ে পড়ে নীলু। দরজা খোলা।

অদ্ভুত ব্যাপার বলতে হবে! এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল, কিন্তু নীলু একেবারে চুপ। একটা কথা বললে না। থানার দারোগার কাছে পর্যন্ত মুখ খুলল না। শুধু বললে, 'আমি জানি না, কে আমায় মেরেছে। অন্ধকারে দেখতে পাই নি। আমার বউ কোথায় গেছে, আমি তাও জানি না। কাউকে আমি সন্দেহ করি না।'

একটা চোখ একেবারেই গেল নীলুর—পাতা বন্ধ হয়ে গেল, কুঁচকে ভেতরে ঢুকে গেল। মণি আর দেখা যেত না। তা না যাক, প্রাণটা তো বাঁচল!

এর পর নীলু মদ ধরলে। একে-একে সব রকম নেশা। তিন মাসের মধ্যে নীলু একেবারে কাঠিসার। এত বিশ্রী আর কুৎসিত চেহারা হয়ে উঠল যে, লোকে নানান সন্দেহ করতে লাগল।

স্কুলের চাকরিটা গিয়েছিল। অমন বেহেড মাতাল, ক্ষ্যাপাটে লোককে স্কুলে রাখা যায় না।

সেসব দিন নীলুর খুব কষ্টেই গেছে। খেতে পায় নি, ঘটিবাটি বিক্রি করেছে। তবু মদ খেয়েছে। বাজারে ধার, মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে আলু-পটল বিক্রি করেছে, মল্লিকদের গ্যারেজে কুলি খেটেছে, রাস্তাঘাটে পড়ে থেকেছে, আর মদ খেয়েছে।

তখন থেকে সবাই ওকে কানা নীলে বলত। আমরাও।

শেষ পর্যন্ত পুলিন সামন্তর মতন লোককে ধরে কি ক'রে যে ময়ুরগঞ্জ মিউনিসিপালিটিতে একটা চাকরি জুটিয়ে নিল নীলু, কে জানে!

কাজটা কি ? কানা নীলে বলত—'হোআট নট ! ফ্রম প্রিভেন্‌শন টু স্যানিটেশন !'

কথাটা একরকম সত্যিই। ঝড়ঝড়ে একটা বাইকে চেপে হাড়-লিকৃলিকে কানা নীলে প্রথমে আসত বাজারে; মাংসের দোকানে এসে চামড়া-আড়াল নীল কাঁচের গগ্‌ল্‌সের মধ্যে দিয়ে ছাল-ছাড়ানো পাঁঠাগুলো দেখত। এক খাবলা মাংস উঠিয়ে গন্ধ শুঁকত, আরও যেন সব কি কি—। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে ভাঙা খ্যাস্‌খেসে গলায় বলত, 'ঠিক হ্যায়—ফ্রেশ মিট !'

তারপর মাছ। 'সড়া মছ্‌লি ! চলো, হঠাও ! আদমি মারেগা, শালা ডাকু ! থ্রো দেম ! হঠাও—হঠাও জল্‌দি !'

তারপর বাজারের এ-পাশ ও-পাশ। কোথায় নোংরা, কোথায় গন্ধ ! ঠিক হ্যায় !

বাজার থেকে বেরিয়ে ঝড়ঝড়ে বাইক চেপে সারাটা ময়ূরগঞ্জ। মেথর-ধাঙড়ের কাজ দেখত, ময়লা-ফেলা মাঠে চক্কর মারত। শেষে গোরস্থানের কাছাকাছি সেই ময়লা-পোড়ানো কুয়োর মতন বিরাট চুল্লিটার পাশে গিয়ে বসত। ময়ূরগঞ্জের জমানো ময়লা এখানে ডাঁই হয় রোজ; দু-তিন দিন অন্তর আগুন ধরানো হয় তাতে। পুড়ে ধোঁয়া আর ছাই হয়ে যায় সব—সারা ময়ূরগঞ্জের আর্বজনা।

কানা নীলে পানের ছোপ-ধরা দাঁত বের ক'রে হেসে বলত, 'পিওর এআর ! এক্কেবারে পিওর বাতাস এখানে !'

আমরা বলতুম, 'হয়েছে ভাল ! কানা নীলের কাছে ঘেঁসলে বমি আসে, বেটা এমনি ময়লা ! মুখে দুর্গন্ধ, গায়ে চিট কাপড়, মাথায় উকুন—আর সেই কিনা ময়ূরগঞ্জ মিউনিসিপাল এলাকার স্যানিটেশন দেখে

বেড়াচ্ছে!'

ময়ূরী দর্শনের পর কানা নীলের মতন একটা নোংরা জীবকে চোখে দেখতে হবে—ভাবলেও আমাদের গা ঘিনঘিন করছিল। কিন্তু উপায় কি!

প্রায় আধ-ঘণ্টাখানেক পরে কানা নীলের চেহারাটা দেখা গেল। ঝড়ঝড়ে সাইক্‌ল্‌টা প্রাণপণে হাঁকিয়ে আসছে নীলে। অপূর্ব সে দৃশ্য! রোগা টিংটিঙে চেহারা, মালকোঁচা মেরে কাপড় পরা, কামিজটা তলায় গোঁজা, গায়ে একটা সুতির ছেঁড়া তালি-মারা কোট, মুখ-ভরতি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। নীলের সাইক্‌লে ঘন্টি নেই, সরু একটা কঞ্চি বিচিত্র কায়দায় চলতি সাইক্‌লের স্পোকে ছুঁইয়ে কিটি-কিটি-টি কিটি-কিটি এক শব্দ ক'রে ও রাস্তার লোক সরায়।

দোকানের সামনে আসতেই আমরা সমস্বরে ডেকে উঠলাম। গগ্‌ল্‌সের মধ্যে দিয়ে নীলে তাকাল। হাত নাড়ছিলাম আমরা, চিৎকার ক'রে ডাকছিলাম। নীলে থামল না। হাত নেড়ে ইশারায় জানাল, বাজার থেকে ঘুরে সে আসছে।

প্রায় মিনিট পনর পরে নীলে এল। সাইক্‌ল্‌টা চায়ের দোকানের সামনে কাঠের বেন্‌চ্‌টায় ঠেস দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল।

সতু বললে, 'এস, দাদা—বস। তোমার জন্যে আমরা হাঁ ক'রে বসে আছি।'

'চা খাবি, নীলে?' অশোক শুধাল, 'খা এক কাপ! ওগো মদনবাবু—দাও, এক কাপ ফার্স্ট ক্লাস চা ক'রে দাও।'

'স্ট্রং! নো মিল্ক!' নীলে তর্জনী তুলে দোকানের মালিক মদনবাবুকে তার চায়ের পছন্দটা বুঝিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসল। বসে বলল, আমাদের

সকলের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে, 'ইউথ লিগ হ্যাজ মাস্টার্ড স্ট্রং—হেঃ —সবাই যে তোমরা! কানাই কই, কানাই?' ভাঙা খ্যাস্‌খেসে গলায় যেন হিক্কা তুলে তুলে হাসছিল নীলে।

'কানাই আজকাল গুড্‌ বয় হয়ে গেছে। সকালে ট্যুইশনি করে, দুপুরে টরে-টক্কা প্র্যাক্‌টিস, বিকেলে দত্ত মশাইদের দোকানে হিসেব লেখে।' প্রফুল্ল জবাব দিল।

'বল কি হে! কানুটা শেষ পর্যন্ত হিসেব লিখছে!' নীলে বিড়ি বের করছিল। ত্রিদিব চট ক'রে একটা সিগারেট এগিয়ে দিল।

'সিগরেট? দূর, ওতে নেশা হয় না!'

'আরে নাও, নাও—ধরাও তো!' ত্রিদিব গুঁজে দিল হাতে।

চা এল। র চা। সিগারেট ধরাল নীলে।

সতু বললে তারপর, 'ভাই, ব্যাপার কি তোমাদের?'

মুখ তুলল নীলে। বুঝতে পারল না।

কি ক'রে বলি, কথাটা তুলি—ভাবছি আমরা। ভাবছি, আর ঠিক এমন সময়ে বাজারপাড়ার মোড়ের মাথায় সেই ময়ূরীর রিক্‌শ উঁকি দিয়ে উঠল। বীরু একটা শব্দ ক'রে ইশারা করতে না-করতেই আমাদের পাঁচ জোড়া চোখ রিক্‌শয় ছিটকে গিয়ে পড়ল।

ময়ূরী বসেছিল। কি আল্‌গা ভঙ্গি! মুখ নিচু ক'রেই। দুটি হাত ভয়ানক ব্যস্ত। উল-বোনা কাঁটায় কিসের যেন বুনন উঠছিল। কোলের ওপর পশমের গোলাটা বেড়ালবাচ্ছার মতন কুঁকড়ে পড়ে আছে।

ময়ূরীর রিক্‌শ মোড় ঘুরে গেলে সতু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীলের দিকে তাকাল।

কড়া চায়ে চুমুক দিয়ে দিয়ে, ঠোঁট গাল কুঁচকে কুঁচকে মিটিমিটি হাসছিল নীলে।

'খাশা জিনিস ইম্‌পোর্ট করেছিস, নীলে!' অশোক বলল, 'এল কোথা থেকে?'

'কলকাতা।'

'কি নাম?' বীরু শুধাল।

'যমুনা!' নীলে সিগারেটে শেষ-টান দিল।

'ও কি দাইগিরি করবে?' ত্রিদিব উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারছিল না।

'না করলে আর চাকরি নিয়েছে কেন!' নীলে এবার বিড়ি ধরাল।

'অমন মেয়ে, ওইটুকু মেয়ে—' প্রতুল আফশোস করছিল, 'আমরা ভেবেছিলাম—মেয়ে-ডাক্তার, অন্তত মিড-ওআইফ!'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—তেমন সাংঘাতিক কিচ্ছু না!' নীলে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল।

সতু আচমকা বললে, 'পুলিন সামন্ত ওকে কত মাইনে দিচ্ছে?'

নীলে হেসে উঠল। ভাঙা খ্যাস্‌খেসে গলায় অট্টহাসি। বললে যেতে যেতে, 'নট এ সিংগ্‌ল্‌ পাইস মোর! আগের নিভাননী যা পেত—সিক্‌স্‌টি!'

ষাট! মাত্র ষাট টাকায় কলকাতার এই ময়ূরী পুলিন সামন্ত ময়ূরগঞ্জে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে! বাহাদুর বলতে হবে!

আমি বললুম, 'মাইনেতে কি এল-গেল! এক্‌স্‌ট্রা ইন্‌কাম আছে না ওর! একটা বাচ্ছা-কাচ্ছা বিইয়ে দিতে পারলেই বখশিশ—পাঁচ, দশ, পনর-বিশও আছে!'

ত্রিদিব একটা হিসেব কষে ফেললে মনে মনে তখনই। 'অ্যাভারেজে ময়ূরগঞ্জের মান্‌থ লি বার্থ রেট্‌ ফোর টু সিক্‌স্‌।' ও বলছিল, 'মানে ধর, অ্যানাদার ফর্‌টি রুপিস মিনিমাম্‌!'

যমুনার উপার্জনের যোগফল এইভাবে তিন অঙ্কে উঠিয়ে দিয়ে আমরা যেন নিশ্চিন্ত বোধ করলাম।

মাসখানেক পরে সতু এসে বললে, 'ওরে, হিমাংশু—আমাদের হিমাংশুর সঙ্গে ময়ূরীর আলাপ হয়েছে।'

যমুনাকে আমরা আমাদের মধ্যে ওই নাম দিয়েছিলাম। ময়ূরী।

'কি ক'রে হল?' বীরু শুধাল।

'হিমাংশুর বৌদির বাচ্ছা হল সে দিন; ময়ূরী যেত-আসত ওদের বাড়িতে।'

হিমাংশুর সৌভাগ্যের কথা আমরা ভাবলুম সকলেই। এবং তাকে হিংসে করলুম।

এবং ঠিক এই সময়েই প্রফুল্ল বললে, 'তোরা এবার হিসেব কর, তোদের কার-কার বাড়িতে ময়ূরীর যাবার চান্‌স্‌ আছে।'

আমরা অবশ্য সকলেই মুখে হাসলুম প্রফুল্লর কথা শুনে; কিন্তু মনে মনে হিসেবটা আর কেই বা না করেছি!

কিন্তু কি দুর্ভাগ্য যে, আমাদের ইউথ লিগের ক'জন চাঁই—মানে আমাদের পাঁচজনের বাড়িতে কারুরই এমন কোনও বৌদি, দিদি, বোন, পিসি ছিল না, যার জন্যে ময়ূরী আসতে পারে কিংবা তাকে বাড়ি বয়ে ডেকে আনার একটা সুযোগ আমরা পেতে পারি। হয়তো কথাটা ভেবে ভীষণ হতাশ হচ্ছিলাম আমরা এবং এতকাল বাড়িতে যে ঝামেলা অসহ্য মনে হত, এখন সেই ঝামেলা শীঘ্রি আর হবার আশা নেই দেখে দুঃখ হচ্ছিল।

বীরু বললে, 'আমার এক পিসতুতো বোন আছে চকবাজারে। ছেলেপুলে হবে তার। তাকেই কি এনে তুলব নাকি জয়-মা বলে!'

আবার আমরা হাসলুম।

এইবার ত্রিদিব একটা সিগারেট ধরিয়ে হঠাৎ খুব·গম্ভীর হয়ে বলল, 'একটা কথা তোমরা জান না।'

জানি না! কি, কি কথা! আমরা সকলেই ত্রিদিবের দিকে তাকালাম চোখে প্রশ্ন তুলে।

'আমাদের ময়ূরীর লভার আছে একজন। হপ্তায় দুটো চিঠি বাঁধা।'

'কে বললে? কেমন ক'রে জানলে তুমি?'

'আমি দেখেছি নিজের চোখে—রঙিন খামে চিঠি। গোটা-গোটা সুন্দর ক'রে নাম লেখা।'

'বাজে কথা, বাজে কথা! কি ক'রে দেখলে তুমি? আমরা বিশ্বাস করতে চাইছিলুম না।

'আমায় বলেছে—আমায় দেখিয়েছে!' ত্রিদিব তার কথা থেকে টলল না।

'কে বলেছে? কে দেখিয়েছে?'

'নীলে।'

'নীলে!' আমাদের চায়ের টেব্‌লের ওপর যেন আচমকা কতকগুলো আরশোলা ফরফর ক'রে উড়তে লাগল।

'নীলে যে পোস্ট-অফিস থেকে ওর চিঠি নিয়ে যায়!' ত্রিদিব বললে। 'সেই খাম আমি দেখেছি—নীলে দেখিয়েছে।'

'কেন? পিওন—সরকারী পিওন আছে কি জন্যে? সে কি করে?' বীরু হঠাৎ খাপ্পা হয়ে উঠল।

পিওন কি করে, সে কথার জবাব ত্রিদিব দিল না। বললে, 'হুকুম আছে নীলের ওপর—ময়ূরীর নিজের গরজেই। তাই উইন্‌ডো-ডেলিভারি নিয়ে যায়।'

আমরা ভেবে পাচ্ছিলুম না—আর, ভাবতেই সারা গা ঘিনঘিন করছিল—নীলের নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, কুৎসিত এবং দূষিত জামার কোথাও, কোনও পকেটে একটি সুন্দর প্রেমপত্র থাকতে পারে।

সতুই বলল শেষে, 'সেই প্রেমিকের নাম কি? কোথায় থাকে?'

'তা জানি না!' ত্রিদিব মাথা নাড়ল।

'নীলে বলে নি?'

'না।'

'চিঠি ছিঁড়ে কিংবা খুলে-টুলে দেখেও নি?'

'না।'

'তবে কি ক'রে ও জানল যে, ওটা প্রেমপত্র?' সতু যেন ত্রিদিবকেই ধমকে উঠল।

পরে অবশ্য আমরা ঠিক করলাম, এই চিঠি একটা নীলের কাছ থেকে হাতাতে হবে।

ময়ূরগঞ্জে শীতটা সেবার খুব জোর পড়ল। সকাল দশটার আগে আর কুয়াশা সরত না; আর ওদিকে বিকেল শেষ হতে না-হতেই সব ঝাপসা হয়ে আসত। সাংঘাতিক কুয়াশা আর হিম; শীত আর ঠাণ্ডা হাওয়া। গায়ে দাঁত ফুটিয়ে দিচ্ছিল।

এত শীতের মধ্যে শুরু হল বৃষ্টি। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। আর মেঘলা। উত্তরে হাওয়াও দিচ্ছিল মাঝে-মাঝে।

আমরা—আমি, সতু আর ত্রিদিব—এই শীত, ঝিরঝির বৃষ্টি আর হাওয়ার মধ্যেও সে দিন ফিরছিলাম চকবাজার থেকে। একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল। আটটা বাজার ক্ষীণ ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলাম মিউনিসিপালিটির অফিসের কাছে এসে। কোতোয়ালিতে ঘণ্টা বাজছিল।

মিউনিসিপালিটির অফিসের তেমাথা মোড়ে অবশ্য একটা বাতি ছিল। আর আমাদের সাইক্‌লের ল্যাম্প। অত ঘন কুয়াশায় সে ল্যাম্প কোনও কাজে আসছিল বলে আমাদের মনে হয় নি। একরকম পথ হাতড়ে অন্ধের মতই আমরা আসছিলুম। শীতে হাত-পা জমে যাচ্ছিল।

তেমাথার মোড় ছাড়িয়ে আসতেই হঠাৎ ধক্ ক'রে একথাবা সাদাটে আলো গায়ে পড়েই নিভে গেল।

'কে রে টর্চ মারছে?' সতু বললে।

'হবে হয়তো কোনও লোক! পথ দিয়ে যাচ্ছে!'

আরও খানিকটা এগিয়ে এসেছি—আবার টর্চ মারল কে যেন। এবার খানিক কাছ থেকেই। আলোর থাবাটা সহজে নিভল না; আমাদের গায়ে-মুখে ঘুরে ঘুরে তারপর নিভে গেল।

'কে রে?' সতু হাঁকলে।

কোনও জবাব নেই।

'টর্চ গায়ে ফেলছে কে?' আমি হাঁকলুম আবার।

সব চুপ। জবাব দিল না কেউ।

'আমরা চোর-ছ্যাঁচড় নই, চাঁদ!' ত্রিদিব গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে বলছিল।

সাইক্‌লের একটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছিল, আমাদের সাইক্‌ল্-ল্যাম্প সামনের কুয়াশার গায়ে একটু শুধু আবছা আলোর আভাস ছড়াচ্ছিল, আর আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ—হ্যাঁ, হঠাৎই—সেই অন্ধকারে কোথা থেকে কর্কশ স্বরে কে যেন চিৎকার ক'রে উঠল, 'চোর, চোর, চো-র!' সেই টর্চের আলো দপ্ ক'রে একবার জ্বলল, একবার যেন কুয়াশার বুকে সাঁতার কেটে দিশা খুঁজল। তারপর নিভে গেল।

আমরা চমকেই উঠেছিলুম। টকাটক্ সাইক্ল্ থেকে নেমে পড়লুম। কে চোর, কোথায় চোর, কোন্ দিকে দৌড়ে গেল, কোথায় পালাল—কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। তিনজনেই অবাক, স্তম্ভিত।

সতুই প্রথমে কথা বললে, 'কি রে, শেষ পর্যন্ত আমাদেরই চোর ভাবলে নাকি? চল্ তো, দেখি!'

ততক্ষণে সামান্য একটু দূরে একটা বাড়ির জানলা খুলে গিয়েছে। ভেতরে লণ্ঠনের আলো।

সাইক্ল্ ঠেলে ঠেলে আমরা জানলার কাছে এসে পৌঁছলাম। গরাদের ওপর আবক্ষ একটা ছায়া-ছায়া মূর্তি ভেসে উঠেছে। সামনে আসতেই ছ' জোড়া চোখ খোলা জানলার দিকে চেয়ে থমকে গেল।

ময়ূরী! আমাদের ময়ূরী!

ময়ূরীও আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। আর আমরা বিহ্বল হয়ে লণ্ঠনের আলোয় শাল-জড়ানো সেই আশ্চর্য চেহারাটা দেখছিলাম।

অবস্থাটা অদ্ভুত। আমরাও আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলাম।

সতু—এবারেও সতু—কথা বললে প্রথমে, 'চোর কই? কোথায় পালাল?'

সতুর এই অত্যন্ত বোকার মতন প্রশ্নেও তখন আমরা হাসতে পারি নি। বরং খুব স্বাভাবিকই মনে হয়েছিল প্রশ্নটা।

ময়ূরী যেন গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, 'আমার বাড়িতে নেই।'

এবার, ময়ূরীর এই জবাবের পর, আমরা সব খেয়াল করতে পারলুম। লজ্জা হচ্ছিল। ত্রিদিব অনেকটা কৈফিয়ত দেবার সুরে বলল, 'রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছিলুম, চোর-চোর শুনে আসছি। টর্চ ফেলছিল কে? কোথায় সে?'

'জানি না।' ময়ূরী ছোট্ট ক'রে জবাব দিল। একটু থেমে আপন মনেই হঠাৎ বললে আবার, 'অদ্ভুত জায়গা তো! এই নিয়ে চার-পাঁচ দিন হল। রাত্তিরে কি এখানের লোকেরা চোর-চোর খেলে!' ময়ূরী জানলা থেকে সরে গেল।

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে ময়ূরীর ঘরের মশারির মাথা, আলনা, একটা ক্যালেন্ডার বুঝি ক' মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম; তারপর সাইক্লের হ্যান্ড্ল্ ঘুরিয়ে পিছু হঠলাম।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, জানলা বন্ধ করছে ময়ূরী।

সতু বললে, স্ট্রেন্জ্ ব্যাপার! শুনলি তো, কি বললে ময়ূরী? এই নিয়ে চার-পাঁচ দিন চোর-চোর ডাক উঠেছে।'

'চোরটা কে?' ত্রিদিব হাতে সিগারেট গুঁজে দিতে দিতে বললে।

'কি চুরি করতে আসছে, তাও বোঝা যাচ্ছে না।' বললুম আমি। 'ময়ূরীর বাড়িটা একটু তফাতে পড়েছে—তবু তো এটাও পাড়া! কিন্তু বারবার এখানেই চোর আসছে কেন? কেমন চোর সে!'

'নিশ্চয়ই কোনও চিত্তচোর।' ত্রিদিব জায়গামতন টপ্ ক'রে যুগিয়ে দিলে কথাটা।

আমরা হেসে উঠলুম। তিনজনেই।

খানিকটা এগিয়ে এসে হঠাৎ ত্রিদিব বললে, 'আচ্ছা, সে কোথায় গেল?'

'কে?' আমরা প্রশ্ন করলাম।

'যে চোর-চোর বলে হাঁকল।' ত্রিদিব দাঁড়িয়ে পড়েছিল, 'আশ্চর্য! কোথায় গেল সে? তাকে তো দেখলুম না!'

তাই তো! কথাটা আমরা যেন তালেগোলে ভুলেই গিয়েছিলাম। সেই লোকটাই বা কোথায় হাওয়া হয়ে গেল—যে টর্চ ফেলছিল? সেই

কি চিৎকার ক'রে উঠেছিল? তা হলে পালালই বা কেন?

সমস্ত ব্যাপারটাই আমাদের কাছে ধাঁধাঁর মতন লাগছিল।

পরের দিন সকালে ময়ূরগঞ্জ ইউথ লিগের চায়ের আড্ডায় কথাটা পাড়া হল। বীরু-প্রফুল্লরা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না। 'বলিস কি! চোর যাবে ওখানে? এক পাশে খোদ পুলিন সামন্তর বাড়ি—এক পাশে মল্লিকদের গ্যারেজ, মিউনিসিপালিটি অফিসের বিধুবাবু আর তারা ভাদুড়ির বাড়ি ওখানে!' বীরু-প্রফুল্ল এইসব যুক্তি দেখাচ্ছিল।

সতু বললে শেষে, 'এর মধ্যে কোনও মিস্ট্রি আছে, ভাই!'

রহস্য যে আছে, তাতে সন্দেহ কি! ময়ূরগঞ্জের ময়ূরীর নামে হপ্তায় দুটি ক'রে প্রেমপত্র আছে, বাড়ির সামনে চোর-চোর ডাক ওঠে, টর্চ জ্বলে!

বীরু প্রস্তাব করল, 'আমাদের একটু ওআচ করা দরকার।'

সতু কি আমার বা ত্রিদিবের আপত্তি ছিল না। প্রফুল্লই শুধু মাথা নাড়ল। বলল, 'চোর ধরতে গিয়ে নিজেরাই চোর বনে যাব। কেউ যদি দেখে ফেলে, তা হলে আর রক্ষে থাকবে না।'

'কি হবে?' বীরু শুধাল।

'কি আর! সারা শহর রটিয়ে বেড়াবে, ইউথ লিগের ছোঁড়াগুলো মিউনিসিপালিটির ছুঁড়িটার বাড়ির কাছে রাত্রে ঘোরাঘুরি করে। যায়-টায়।' প্রবীণ লোকের মতন প্রফুল্ল আমাদের সতর্ক করল।

কথাটা মিথ্যে নয়—আমরা সকলেই ভাবছিলাম। এ ক' মাসের মধ্যেই যমুনা ময়ূরগঞ্জে বেশ একটু কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু ময়ূরীর সম্পর্কে এখন যে কৌতূহল বোধ করছি, তার আকর্ষণও যে কম না!

ত্রিদিব অনেক ভেবে-চিন্তে বললে, 'ব্যাপারটা সম্পর্কে আগে আরও একটু খোঁজ-খবর নেওয়া যাক্। তারপর দেখা যাবে।'

'নিবি কোথা থেকে ?'

'কেন ? নীলে !'

'নীলে ?'

'নীলে কিছু জানলেও জানতে পারে। ওর সঙ্গে তো মোটামুটি খাতির আছে মেয়েটার !'

'খাতির—না, হাতি ! পেয়েছে কানা-খোঁড়া এক পাগলাকে—এটা-সেটা করিয়ে নেয়।' বীরু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে। 'আমি তো মাইরি ভেবেই পাই না—ওই ন্যাস্টিটাকে কি ক'রে স্ট্যাণ্ড করে ময়ূরী ! আর, নীলেরও কি লোভানি ! বাজার ক'রে দিচ্ছে, ধোপার বাড়ি কাপড় বয়ে দিয়ে আসছে।'

দিন কয়েক পরে আর এক ঘটনা ঘটল। চায়ের দোকানে বসে বসে চা খাচ্ছি আমরা তিনজন—আমি, সতু আর ত্রিদিব—হঠাৎ প্রফুল্ল ছুটতে ছুটতে এল।

'কি রে, কি ব্যাপার ?' আমরা পেয়ালা থেকে মুখ তুলে তাকালাম।

প্রফুল্ল চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'এখনই দেখতে পাবি—একটু সবুর কর। রিক্শটা আসুক !'

ময়ূরগঞ্জ শহরে রিক্‌শ বলতে একটিই। মিউনিসিপালিটির সেই আল্‌কাতরা-রাঙানো রিক্‌শই। আমরা ময়ূরী এবং রিক্‌শটাকে কল্পনা ক'রে নিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকলুম রাস্তার দিকে।

প্রফুল্ল আবার বললে, 'এখান থেকে ভাল ক'রে দেখতে পাবি কিনা,

সন্দেহ। এক কাজ কর। রাস্তায় চল। অ্যাট-ইজ হয়ে যাবি সব।'

চারজনেই আমরা হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। প্রফুল্ল আগে-আগে, আমরা পিছু-পিছু। মোড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। শিবমন্দিরের কাছাকাছি এসে পড়েছে রিক্‌শটা। ময়ূরী বসে আছে। সেই এক ভঙ্গি।

আমরাও মোড়ের কাছে এসেছি—রিক্‌শটাও মোড় ঘুরে বাজার-পাড়ার ঢালু রাস্তা নিল।

প্রফুল্ল আঙুল দেখিয়ে ইশারা করবার আগেই দেখি, রিক্‌শর পেছনে আল্‌কাতরা-রাঙানো কালো কুচকুচে কাঠের ওপর সাদা কাগজ আঁটা। তাতে আঁকাবাঁকা লাল হরফে লেখা—'যমুনা-পুলিনে নিশি হয়ে যায় ভোর'।

রিক্‌শটা চলে গেল।

আমরা—আমরা চারজনে—কিছুক্ষণ আর কথা বলতে পারলুম না। কথা আসছিল না।

'এর মানে ?' বীরু বললে শেষে।

চায়ের দোকানের দিকে ফিরতে ফিরতে সকলেই আমরা এই অদ্ভুত লেখাটির কথা ভাবছিলুম।

ত্রিদিবই সবার আগে চিৎকার ক'রে উঠল, 'বুঝেছি! সল্যুশন সল্‌ভ্‌ড্‌!'

'কি বুঝলি ?' আমরা তিন মূর্তিমান থমকে দাঁড়ালুম।

'এ তো সহজেই! ময়ূরীর নাম যমুনা। যমুনার সেই যমুনা, আর পুলিন মানে তট—যমুনার তটে আজকাল নিশিভোর লীলা হচ্ছে!' ত্রিদিব মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে চোখে রসাশ্রিত ভাব এনে বললে।

সত্যিই তো! যমুনাতটেই তো বটে! কিন্তু লীলাটা করছে কে?

কেই বা এই গূঢ় খবরটা একেবারে কাগজে লিখে মিউনিসিপালিটির রিক্‌শয় এঁটে রটনা ক'রে দিল? ছি, ছি—কি কাণ্ড! যমুনা আবার সেই রিক্‌শ চেপেই সারা ময়ূরগঞ্জ ঘোরাঘুরি করবে!

'রাম, রাম! এই স্ক্যান্‌ডাল তো আজই রটে যাবে!' আমি বললুম।

'তা তো যাবেই!' ত্রিদিব বললে।

চায়ের দোকানে ফিরে এসে আবার বসেছিলাম আমরা। নতুন ক'রে চায়ের পেয়ালা আসছিল।

হঠাৎ ত্রিদিব বললে, 'বুঝলি, সতু—সেই চোরই তবে সত্যি!'

'ওই কি টর্চ ফেলত?' সতু বললে।

'আর নিজেই কি ও চোর-চোর হাঁকত?' আমি সন্দেহ প্রকাশ করলাম।

বীরু আর প্রফুল্ল কি ভাবছিল।

'যে চোর-চোর হাঁকত, সে নিশ্চয় যমুনার চিত্ত-চোর নয়!' বীরু বললে।

'আর একজন কেউ আছে—যে হাঁকত, যে কবিতার লাইন লিখে রিক্‌শর পেছনে এঁটেছে। কে সে?'

ঠিক! আর একজন আছে! আড়ালে। সে কে?

ত্রিদিব বললে, 'এটা জেলাসি হতে পারে। হয়তো ওই কাঁচা-বয়সের ময়ূরীটিকে বাগাতে পারছে না বলে এ বেটা পাহারাদারি করছে।'

তা হতে পারে! আমরা সবাই মাথা নাড়লুম। এবং ভাবলুম, ময়ূরগঞ্জ মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স এলাকার মধ্যে বেহায়া একটা কাণ্ড বেশ পুরোদমেই চলছে। পুলিন সামন্তর নজর এড়িয়ে। আজ যা ঘটল, এর পরও কি পুলিন সামন্তর নজর পড়বে না? তারপর—?

যমুনার লীলাখেলা তো ঘুচল এখান থেকে! অন্নজল উঠল। পুলিন সামন্ত বড় কড়া লোক। চরিত্র স্খলনের সাধারণ সুযোগটা পর্যন্ত রাখে নি, এমন গোঁড়া—বেশ্যাপাড়াটা পর্যন্ত চকবাজারে পাঠিয়ে ছেড়েছে।

দিন দুই পরের কথা। প্রফুল্লদের বাড়িতে বাইরের ঘরে বসে তাস খেলছি। বেশ শীত। তখন বোধ হয় আটটা বাজে। হঠাৎ দড়াম ক'রে দরজা খুলে ত্রিদিব আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ল। মুখ-চোখ দেখলেই বোঝা যায়, সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে। উত্তেজনায় ওর চোখ-মুখ কেমন যেন দেখাচ্ছিল।

দরজাটা বন্ধ করতে ইশারা ক'রে ত্রিদিব বললে, 'তোদের খাওয়া-দাওয়া হয় নি কারুর—না? দরকার নেই খাওয়ার! আচ্ছাসে র‍্যাপার আর মাফলারে মাথা-গলা ঢেকে নে—নিয়ে চল। টর্চ নিতে হবে সকলকে হাতে-হাতে। আছে টর্চ?'

আমাদের হাতের তাস ততক্ষণে সতরঞ্জিতে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি বললুম, 'ব্যাপার কি? তুই যে একেবারে রীতিমত হেঁয়ালি শুরু করলি!'

'আরে, না—না! এবার সব হেঁয়ালি পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'মানে?'

'চোর ধরতে যাচ্ছি আমরা। সেই চোর—যমুনা ময়ূরীর বাড়িতে যে নিশি ভোর করতে যায়।'

আমাদের গায়ের রক্ত যেন হঠাৎ কিসের এক তাপ লেগে উষ্ণ হয়ে উঠল।

'বলিস কি! তা তুই হঠাৎ এ গুপ্ত খবর পেলি কোথা থেকে?' প্রফুল্ল শুধাল।

'পেয়েছি—বাই চান্‌স্‌ পেয়ে গেছি। কিন্তু দেরি নয় আর—তাড়া-

তাড়ি চল্। টর্চ আর মাফলার-টাফলার নিয়ে নে। বলা যায় না, হয়তো সারা রাত ওএট করতে হবে।'

প্রফুল্লর বাড়ি থেকে যে যার বাড়ি ছুটলাম। দুটো পেটে গুঁজে টর্চ হাতে ক'রে আধ-ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা সব মিললুম আবার। রক্তে তখন কিসের এক দোলা লেগে গেছে। নেশাও বলা যায়।

ত্রিদিব বললে, 'চল। ভেরি কেআরফুল থাকবি কিন্তু সব। আর, যেই না আমি সিটি মারব—তোরা সকলে টর্চ মেরে মেরে একেবারে ফ্লাড ক'রে দিবি বাড়িটার চারপাশ।'

যমুনার বাড়ির কাছাকাছি এসে আমরা ত্রিদিবের কথামতন পাঁচজনে পাঁচ জায়গায় ছড়িয়ে লুকিয়ে থাকলুম। রাত বাড়ছিল। একেই শীতকাল, তার ওপর জানুআরির শীত। গা অসাড় হয়ে আসছিল। কোথাও কাউকে দেখছিলাম না। দেখার উপায়ও নেই। ঘুটঘুটে রাত। তার ওপর কুয়াশা। মিউনিসিপালিটি অফিসের তেমাথার মোড়েই যা একটা বাতি জ্বলছে—আর কোথাও বাতি নেই। অথচ এ রাস্তায় আরও দু-তিনটে বাতি ছিল। সেগুলো আজকাল আর জ্বালানো হচ্ছে না। কেন, কে জানে! হয়তো ময়ূরীর বাড়িতে চোর আসবে গা-ঢাকা দিয়ে, তাই এ সুযোগ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

একটা দেবদারু-গাছের তলায় ছিলাম আমি। ঠাণ্ডায় নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। সিগারেট খাবার উপায় নেই—ত্রিদিবের বারণ। একটা গরুর গাড়িও যাচ্ছে না রাস্তা দিয়ে। শুধু দূরে কোথায় যেন কুকুর ডাকছে। এখানে সব নিঝুম, থমথম। ময়ূরীর বাড়ি অন্ধকারে তলিয়ে গেছে—আশেপাশের সব ক'টা বাড়িই। কোথাও একছুঁচ আলো নেই।

কোতোয়ালি থেকে ঘণ্টা পড়ে গেল বারটা।

শীতের একটা ধারালো হাওয়া সারা গায়ে দাঁত বসিয়ে গেল। একটা পেঁচা ডেকে উঠেছে। বীভৎস, কর্কশ। চোখের সামনে কুয়াশা ঘন হয়ে হয়ে অন্ধকারকেও যেন শুষছে।

কোতোয়ালিতে আবার ঘণ্টা পড়ছে। একটা বেজে গেল।

চোর কই ? কোথায় ?

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সমস্ত ঘুমটা ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে। কাঁপুনি দিচ্ছে ভীষণভাবে। মাথাটাও যেন সাড় হারাচ্ছে।

হঠাৎ দপ ক'রে টর্চ জ্বলে উঠল পশ্চিমে। একটুক্ষণ একটা সাদা উজ্জ্বল চোখ যেন সাপের মত চারপাশ দেখে নিল। তারপর নিভে গেল আবার।

কে জ্বালাল টর্চ ? আমাদের কেউ নয় তো ? না, ত্রিদিবের সিটি না শোনা পর্যন্ত আমাদের টর্চ জ্বালানো নিষেধ।

কান পেতে থাকলুম। কোনও শব্দ নেই।

অনেকক্ষণ পরে আর একবার দপ ক'রে টর্চ জ্বলল।

ময়ূরীর কোআর্টারের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে সে। টর্চ জ্বালল। এদিক-ওদিক বাতি ফেলল। বাতি নিভিয়ে নিল একটু পরেই।

পা তুলে, কান খাড়া ক'রে অপেক্ষা করছিলুম—এইবার, এইবার চোর-চোর হাঁক শুনব। আর, শোনার সঙ্গে টর্চ জ্বেলে ছুটব ময়ূরীর বাড়ির দিকে।

কিন্তু কেউ আর চোর-চোর হাঁক দিল না।

হল কি ? সেই লোকটা কি আজ আসতে ভুলে গেল ? না, টর্চ হাতে যে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই হাঁক পাড়ত ? আজ আর চোর আসে নি—

হাঁকও পাড়ছে না তাই !

হঠাৎ বিশ্রী একটা চিৎকার সেই থমথমে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার চিরে যেন আমার কানের পরদায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ যেন অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভীষণভাবে কেঁদে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে দপদপ ক'রে চারটে টর্চ জ্বলে উঠল চারদিকে। ত্রিদিব সিটি মেরে দিয়েছে। আমিও টর্চ জ্বালিয়ে ছুটতে শুরু করলাম। পাঁচটা টর্চ পাঁচ দিক থেকে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে। কে যেন ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল। ওই—ওই ! ত্রিদিব ডাক দিচ্ছিল, 'এ দিকে—এ দিকে।' বীরু চিৎকার করছিল। সতুও হাঁকছিল।

শেষ পর্যন্ত প্রফুল্লই ধরে ফেলল তাকে।

ত্রিদিব হঠাৎ ডাকল, 'এ দিকে আয়। শিগগির !'

ময়ূরীর জানলা ফট ক'রে খুলে গেল। ভেতরে লণ্ঠনের আলো। শাল-গায়ে ময়ূরী।

ত্রিদিবের কাছে ছুটে গেলাম আমরা। টর্চের আলোয়—হ্যাঁ, ত্রিদিব আর প্রফুল্লর জোড়া টর্চের আলোয়—স্পষ্টই ফুটে উঠেছে সেই চোর। কিন্তু এ কি ! আমরা আঁতকে উঠলাম। পুলিন সামন্তর ভুরুর পাশ দিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে। পুলিন সামন্ত মাটিতে বসে। জামার একটা পাশ থাবলা ক'রে ধরে চোখে টিপে ধরবার চেষ্টা করছে।

ময়ূরী খোলা জানলা দিয়ে ব্যাকুলভাবে বললে, 'কি হয়েছে, কি ?'

'পুলিনবাবুকে ছুরি মেরেছে।' কেমন এক স্বরে যেন বললে ত্রিদিব।

ময়ূরী যেন চমকে উঠে একটা ভয়ার্ত অস্ফুট শব্দ করলে। আর কি আশ্চর্য, নিমেষে ফট্‌ ক'রে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিল।

আমরা অবাক। বিমূঢ়।

'আমায় যেতে দাও, যেতে দাও।' পুলিন সামন্ত যন্ত্রণায় ছটফট

করছিল।

পুলিন সামন্তকে আমরা বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছিলুম। কিছুতেই রাজি হল না। একাই লোকটা চলে গেল পথ হাতড়ে হাতড়ে অন্ধের মতন, শীতে আর অন্ধকারে।

পাঁচটা সিগারেটের আগুন যখন টিপটিপ ক'রে জ্বলছে, সার বেঁধে আমরা ফিরছি—ইউথ লিগের পঞ্চপাণ্ডব—তখন বীরু বললে, 'পুলিন সামন্তকে ঘায়েল করল কে? কেন? সে গেল কোথায়? তার তো পাত্তাই পেলাম না!'

ত্রিদিব একবার কাশল। জোর একটা টান দিলে সিগারেটে। বললে, 'তার পাত্তা ময়ুরগঞ্জে আর পাওয়া যাবে না বোধ হয়। পালিয়েছে সে।'

'পালিয়েছে?'

'পুলিন সামন্তকে ঘায়েল করার পর আর কি সে ময়ূরগঞ্জে থাকবে! কি সাংঘাতিক কাণ্ড!' ত্রিদিব ভীষণ অন্যমনস্ক সুরে বললে।

ইউথ লিগের পাঁচ জোড়া পায়ের জুতোর শব্দ উঠছিল খট্‌খট্‌, দূরে কুকুর ডাকছিল, কোতোয়ালিতে রাত তিনটের ঘণ্টা পড়ছে, শীত আর জমাট কুয়াশা আর অন্ধকার।

ক' পা এগিয়ে এসে সতু শুধাল, 'এই লোকটা কে? পুলিন সামন্ত এখানে এল কি ক'রে? ব্যাপারটা ভীষণ গণ্ডগোলের—কিছুই শালা মাথায় ঢুকছে না!'

'আমিও তো তাই ভাবছি।' ত্রিদিব মৃদু সুরে জবাব দিল।

'তোকে চোর ধরার খবরটা দিয়েছিল কে?' প্রফুল্ল প্রশ্ন করলে।

'কানা নীলে।' ত্রিদিব বললে, 'বলেছিল, আজ যেয়ো দলবল নিয়ে—চোর যদি ধরতে চাও।'

আমরা আর একবার সবাই চমকে উঠে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ত্রিদিব নিজের থেকেই বললে, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, নীলেই পুলিন সামন্তকে জখম করেছে। তবে কি যমুনা-পুলিনের পুলিন আমাদের চেয়ারম্যান পুলিন সামন্ত?'

তা কি ক'রে সম্ভব? পঞ্চাশ বছরের বুড়ো, ভীষণ কড়া এই লোকটা কি এইসব নোংরা কাজের মধ্যে থাকতে পারে! ভাবতেও আমাদের মন রাজি হচ্ছিল না। এ সম্ভবই নয়। পুলিন সামন্তর আর যে দোষই থাকুক, চরিত্র রক্ষার ব্যাপারে এমন গোঁড়া আর কেউ নেই সারা ময়ূরগঞ্জে। শহরের শুচিতার চেয়েও এ শহরের মানুষগুলোর চরিত্রের শুচিতা রক্ষা করাই ছিল তার বড় কাজ। তার জন্যে কি না করেছে পুলিন সামন্ত! চাঁদমারির কাছের মাঠটায় ছেলেদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছে। ময়ূরগঞ্জের মেয়েরা সেখানে বিকেলে হাওয়া খেতে যায়। মিড্‌ল্ ইংলিশ স্কুলের গার্লস সেকশন আলাদা ক'রে দিয়েছে ছেলেদের থেকে। প্রাইজ, পুজোতে পর্যন্ত চিক আর আলাদা-আলাদা পথের ব্যবস্থা। সেই পুলিন সামন্ত এই বয়সে এমন নোংরামি করবে, সম্ভব নয়। সুনামকে তার বড় ভয়। কবে বউ মরে গেছে—কতকাল আগে—তবু আর বিয়ে করে নি পুলিন সামন্ত; পাছে নিষ্ঠা এবং ভালবাসার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়।

আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বুঝতেও পারছিলাম না, পুলিন সামন্ত এত রাত্রে যমুনার বাড়ির সামনে কেন এসেছিল। কেনই বা ছাড়া পেয়ে পালাবার জন্যে ছটফট্ করছিল। আর যমুনাই বা কেন অমনভাবে জানলা বন্ধ ক'রে দিল।

রহস্য রহস্যই থাকল আমাদের কাছে।

চোখে ছুরির খোঁচা খেয়ে নীলে বেঁচে গিয়েছিল। পুলিন সামন্ত কিন্তু বাঁচল না। জখমের চোটটা নাকি চোখ ছাড়িয়ে আরও ভেতরে পৌঁছেছিল। বাড়ি এসে সেই যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, আর জ্ঞান ফিরে পেল না। কিসের থেকে কি হল—তিন দিনের দিন মারা গেল পুলিন সামন্ত।

কোতোয়ালিতে আমরা নিজেরাই গিয়েছিলাম। বলেছিলাম সমস্ত কথা। নীলেকে বাস্তবিকই আর ময়ূরগঞ্জে পাওয়া যাচ্ছিল না।

তার দেখা পাওয়া গেল পুলিন সামন্তর শব যখন বার্নিশ-তোলা দামী খাটে চড়িয়ে, ফুলে ফুলে ঢেকে, এসেন্স আর অডিকোলনের গন্ধে বাতাস ভরপুর ক'রে আমরা ময়ূরগঞ্জনিবাসী আবালবৃদ্ধ জনতা শব সৎকার করতে চলেছি—তখন।

নীলে এল। ছেঁড়া হাফ-প্যাণ্ট পরনে, গা খালি, গলায় একটা রুমাল বাঁধা, চোখে সেই গগ্‌ল্‌স, গালময় খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

শব নিয়ে সবে তখন দরজা ছেড়ে বারান্দায় নেমেছি—নীলে ছুটে এসে খাটের একটা কোণে কাঁধ লাগাবার চেষ্টা করলে।

তাড়া দিয়ে উঠল সকলে। থানার দারোগা আদিত্যবাবু দলে ছিলেন। ডাকলেন নীলেকে। নীলে ছুটে গিয়ে পা জড়িয়ে পড়ল। কি যেন সব বললে পাগলের মতন। আবার ফিরে এসে দলে ভিড়ল। লোকটা যেন বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। লাফাচ্ছে, চিৎকার করছে, আগে-আগে ছুটছে—দু বাহু তুলে যেন নৃত্য করছে। তার কাণ্ড দেখে মনে হচ্ছিল—এটা যেন শোকের ব্যাপার নয়, সুখের ব্যাপার।

এমন আর আমরা কখনও দেখি নি। শাসানি, ধমকানি, নিষেধ, এমন কি দু-চারটে চড়-চাঁটিও যে না পড়ল, তা নয়—তবু গ্রাহ্য নেই নীলের। গলা ফাটিয়ে হরিবোল দিচ্ছে—লাফাচ্ছে, যেন ভীষণ, ভীষণ খুশী

হয়েছে লোকটা।

শ্মশানের রাস্তায় যাবার পথে এক জায়গায় এসে নীলে আর কাউকে এগুতে দেবে না। বলে, 'সামনে নয়, বাঁ পাশে চল—কাঁচা রাস্তা দিয়ে সোজা। ওখানে পোড়াতে হবে।'

নীলে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিল দূরের সেই ময়লা-পোড়ানো কুয়ার মত বিরাট চুল্লিটা, যেখানে ময়ূরগঞ্জের যত রাজ্যের আর্বজনা জমা হয়ে পোড়ে—পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

নীলের পাগলামি অসহ্য হয়ে উঠেছিল। দু-চারবার তাড়াতুড়ি দিয়েও যখন কিছু হল না, ক'জনে মিলে ধরে বেদম মার দিলে। মার খেয়ে নীলের যেন বুদ্ধি খুলল। আশ্চর্য, ও খুব স্বাভাবিকভাবেই এবার পথ চলতে লাগল।

খানিকটা গিয়েছি—হঠাৎ কোথা থেকে চিলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে, পুলিন সামন্তর শবের ওপর ঢাকা রেশমের চাদরখানা টেনে নিয়ে ছুট দিল নীলে। কতক ফুলমালা রাস্তায় ছিটিয়ে পড়ল। সবাই হতভম্ব। আর, সেই ফাঁকে নীলে রাস্তা থেকে মাঠে নেমে পাঁইপাঁই ক'রে ছুটেছে। ওকে ধরবার জন্যে ছুটল ক'জন। ওই ছোটাই সার। নীলের পা যেন শিকারী কুকুরের পা হয়ে গেছে। চোখের নিমেষে এতটা তফাতে চলে গেল যে, ওর নাগাল পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

আমরা শ্মশানের পথ ধরলাম।

সৎকার সেরে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। ফেরার পথে এক জায়গায় এসে আদিত্যবাবু আমাদের—ইউথ লিগের পঞ্চপাণ্ডবকে—বললেন, 'চল তো তোমরা—ডান্‌জেনটা দেখে আসি।'

ময়ূরগঞ্জের যত রাজ্যের ময়লা-পোড়ানো চুল্লিটার কাছে আসতেই নীলেকে দেখা গেল। জামরুল-গাছের তলায় চিত হয়ে শুয়ে আকাশের

দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম—কিন্তু খেয়ালই নেই নীলের।

ত্রিদিব ডাকল।

ধড়মড় ক'রে উঠে বসল না নীলে—শুধু ঘাড় একটু ঘুরিয়ে তাকাল। আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'আয় বস্; এখানে আজ খুব পিওর এআর—আকাশটা পর্যন্ত শালা ফুলের মত সাদা হয়ে গেছে! বস্, বস্—পিওর এআর নে! সব ময়লা আমি পুড়িয়ে দিয়েছি আজ। ময়ূরগঞ্জ ইজ ফ্রি ফ্রম ইন্‌ফেক্‌শন।'

আমরা চুপ।

আদিত্যবাবুও খানিক চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কিন্তু তোমাকে একবার থানায় যেতে হবে তো, নীলু!'

নীলে আদিত্যবাবুর গলা শুনে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠল। একটু কেমন অদ্ভুতভাবে চেয়ে থেকে হঠাৎ তাঁর পা জড়িয়ে মাথা ঠুকতে লাগল। 'না, স্যার—আজ নয়; আজ স্যার আমায় মাফ করুন। আজ স্যার একবার চকবাজারের বেশ্যাপটির লালবাড়িতে যেতে হবে। আমার সেই বউটা বিধবা হয়েছে, দেখছেন তো! খবরটা পৌঁছে দেওয়া দরকার। ইম্‌পর্ট্যান্ট নিউজ। তা ছাড়া যমুনার কাছে যাওয়াও দরকার একবার—তাকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া কর্তব্য। নয় কি, স্যার? আমরা হিউম্যান বিং। কত ডিউটি আমাদের! একটা কাজ শুধু সেরেছি; এখনও দুটো বাকি—'

আমরা—ইউথ লিগের মেম্বাররা—স্তম্ভিত বিস্ময়ে জামরুল-গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। ক' হাত দূরে চুল্লিটা যেন ঘুমোচ্ছে।

